সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)
তাজা
ঈমানের
ডাক

তাজা ঈমানের ডাক

মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
অনুদিত

এদারায়ে কুরআন
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাওলানা ইল্‌য়াস (রহ.)

আল্লাহর পথের এক অমর দা'ঈ

বিশিষ্ট লেখক গবেষক অনুবাদক ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশের ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগের মুহ্‌তারাম পরিচালক মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী লিখিত

ভূমিকা

তাজা ঈমানের ডাকঃ মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত আলিম, লেখক, মনীষী, দ্বীনের দাঈ ও মুবাল্লিগ এবং মহূর বুযুর্গ মুফাক্কির-ই-ইসলাম আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)-র একগুচ্ছ বক্তৃতার সংকলন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশের নানা অঞ্চল ও অংশে বিভিন্ন মাহফিল ও সেমিনারে প্রদত্ত অসংখ্য বক্তৃতামালা থেকে বাছাই করে মাত্র কয়েকটি বক্তৃতার বাংলা তরজমা বর্তমান সংকলনে পেশ করা হয়েছে। এসব বক্তৃতায় তিনি ঈমান, দাওয়াত ও জিহাদ, সেই সাথে মুসলিম বিশ্বের বর্তমান পতিত দশা এবং তা থেকে মুক্তির পথ নির্দেশনা তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে তিনি মুসলিম উম্মাহ্‌র বর্তমান যিল্লতি ও দুর্দশার পেছনে মূলকারণ হিসেবে তাদের ঈমানের তথা বিশ্বাসের দুর্বল তাকেই চিহ্নিত করেছেন এসব বক্তৃতায়। আল্লাহর ওপর ঈমান, রাসূর (স) -এর ওপর ঈমান, কুরআন কিতাবের ওপর ঈমান আখেরাতের ওপর ঈমান তথা পারলৌকি জীবনের প্রতি বিশ্বাসগত দুর্বলতাই মুসলিম মিল্লাতের বর্তমান অধঃপতনের জন্য দায়ী বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। মুসলিম উম্মাহ্‌র ঈমান আছে, তাদের কাছে ইসলাম আছে, হেদায়াত আছে বটে। কিন্তু তাতে ঈমানের রূহ্‌ নেই, ইসলামের হাকীকত নেই, হেদোয়াতের প্রাণ নেই। যা আছে তা এসবের সূরত তনাবাহ্যিক অবয়ব বা কাঠামো মাত্র। তাই দুনিয়ার বুকে মুসলিম উম্মাহ্‌কে তাদের বর্তমান অবস্থা কাটিয়ে উঠতে হলে, মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে উম্মত শ্রেষ্ঠ হিসেবে তাদের ওপর অর্পিত যিম্মাদারী পালন করতে হলে প্রথমত তাদের ঈমানকে নবায়ন করতে হবে, জীবন্ত করে তুলতে হবে, আকীদা-বিশ্বাসকে সহীহ-শুদ্ধ করতে হবে, ঈমানের মধ্যে রূহ তথা প্রাণের সঞ্চার ঘটাতে হবে। বর্তমান পৃথিবীর সমস্যা ও সংকট মুকাবিলা করতে হলে চাই তাজা ঈমান যেই ঈমানের অধিকারী ছিলেন হুযুর আকরাম (স) এর হাতে গড়া হযরত সহাবায়ে কিরাম (রা), যেই ঈমানের অধিকারী হয়ে তাঁরা অর্ধ-পৃথিবী জয় করে ছিলেন। মানুষের হতাশ অন্তরে আশা-ভরসার প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন অশান্ত পৃথিবীতে শান্তির সুশীতল বাতাস প্রবাহিত করেছিলেন, ন্যায় ও সুবিচার দ্বারা পৃথিবীর আকাশ-বাতাস ভরে তুলেছিলেন।

মুসলিম মিল্লাতের আরেকটি প্রধান সমস্যা হল, মিল্লাতের মূল সমস্যা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে মিল্লাতের নেতৃবৃন্দের ব্যর্থতা। ফলে এর যথাযথ চিকিৎসা হচ্ছে না। রোগের চিকিৎসায় যথাযথ ঔষধ নির্বাচন না হওয়ায় অথবা ভুল দাওয়াই প্রয়োগের দরুণ এর চিকিৎসা দুরুহই থেকে যাচ্ছে। আল্লামা সাইয়েদ নদভী (র) এ ব্যাপারে উম্মাহ্‌র নেতৃবৃন্দের বিশেষ করে উলামায়ে কেরাম ও মাশাইখে ইজামের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এসব বক্তৃতায় এবং বলেছেন, উম্মাহ ক্রমান্বয়ে যেই নাযুক পরিস্থিতির দিকে এগুচ্ছে যদি তাঁরা এসময় পূর্ণ ইখলাস, নিষ্ঠা, ও সতর্কতার সাথে উম্মাহর হাল না ধরেন ইতিহাস তাঁদেরকে ক্ষমা করবে না। কেননা উম্মাহ্‌র কাণ্ডারী হিসেবে তাঁদের দায়িত্বই সর্বাধিক।

আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)-র রেখে যাওয়া এসব বাণী ও বক্তব্য এদেশের আলিম-উলামা ও শিক্ষিত জনগণের মাঝে তুলে ধরাতে কত জরুরী তা না বললেও চলে। যে কয়েকজন আলিম ইতিমধ্যেই একাজে এগিয়ে এসেছেন তরুন আলিম মাওলানা যাইনুল আবেদীন তন্মধ্যে অন্যতম। মূল লেখকের চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসের সঙ্গে অনুবাদকের হার্দ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হলে অনুবাদ যথাযথ ও মানসম্পন্ন হয় না। জীবন্ত হয়ে ফুঠে ওঠে না। অনুবাদক মাওলানা যাইনুল আবেদীন আল্লামা নদভী (র)-র চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসের কাছে পৌছুতে পেরেছেন বলেই তাঁর অনুবাদে মূলের অনুরণন পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে তিনি সার্থক হয়েছেন বলেই আমি বিশ্বাস করি।

দোআ করি, আল্লাহ তাআলা এই তরুণ আলিমের বর্তমান খেদমত কবুল করুন, তাঁর কলম কে আরও মজবুত করে দিন এবং এ ময়দানে আরও দৃপ্তপদে অগ্রসর হবার তৌফিক দিন। দোআ করি, বাংলার মুসলিম জনগণ এসব বক্তৃতা থেকে যেন উপকৃত হতে পারেন।

আহকার
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
২৮.১১.২০০২

আমাদের কথা

পৃথিবী বিখ্যাত মণীষী আল্লাহ'র পথের এক অমর দা'ঈ হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) এর একগুচ্ছ তীপ্ত ভাষণের অনূদিত সংকলন এই 'তাজা ঈমানের ডাক', বক্তৃতাগুলো অনুবাদ করেছেন সুহৃদ গবেষক অনুবাদক মাওলানা যাইনুল আবিদীন। অনুবাদটি আগা-গোড়া সম্পাদনা করে দিয়ে সেই সাথে গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন মাওলানা নদভী (রহ.) এর চিন্তা ও আদর্শের বিশ্বস্ত পতাকাবাহী বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের বিশ্বাকোষ প্রকল্পের পরিচালক মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী। আমরা তাঁর কাছে ঋণী!

আমাদের বিশ্বাস, বইটি গড়ে সকল শ্রেণীর পাঠক সবিশেষ আধুনিক শিক্ষিত স্বচ্ছ মনের অধিকারীজনরা এবং উলামা-মাশাইখরাও আত্মিক তৃপ্তি ও পুলক অনুভব করবেন। খুঁজে পাবে আধুনিক এই অস্থির পৃথিবীতে মুসলিম উন্মাহর মুক্তির মাথা উঁচু করে দাঁড়ার অনির্বান পথ ও সিদ্ধান্ত।

এটি প্রথম সংস্করণ। তাই ভুল ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। হৃদয়বান পাঠকগণ যদি সে দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আমরা কৃতজ্ঞ হবো! আল্লাহ আমাদের নেক সা'ঈ কবুল করুন! আমীন!!

বিনিত
আরিফ বিল্লাহ
২৯.১২.০২ইং

এদারায়ে কুরআন
৫০বাংলা বাজার, ঢাকা।

সূচী

তাজা ঈমানের ডাক

দীন ও ঈমানের পার্থক্য

প্রিয় বন্ধুরা!

এক হলো দ্বীন, আরেক হলো ঈমান! উভয়টির মধ্যে কিন্তু পার্থক্য রয়েছে। কারণ, দ্বীন হলো এমন এক জীবন– ব্যবস্থার নাম, যার পয়গাম নিয়েই আগমন করেছেন সকল কালের সকল নবী! এবং এই দ্বীনেরই সর্বশেষ পয়গাম নিয়ে আগমন করেছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)! তাঁরই মাধ্যমে মহান রাব্বুল আলামীন এই দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে—

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا - (مائدة)

'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম; তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে পূর্ণ করে দিলাম আর মনোনীত করলাম তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে।' [মাইদা]

দ্বীন পূর্ণতা লাভ করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। এখন আর তাতে কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি, বিয়োজন-সংযোজনের সুযোগ নেই। যদি কেউ তাতে কিছু বাড়াতে-কমাতে চায় তাহলে সে মিথ্যাবাদী দাজ্জাল হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু এই দ্বীনের প্রতি ঈমান আনা, বিশ্বাস স্থাপন করা হলো ভিন্ন বিষয়। দ্বীন পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে– তাই এতে কম-বেশি করার সুযোগও নেই, সেই দাওয়াত দেয়ারও অবকাশ নেই। তবে এই দ্বীনে উন্নতি লাভের অবকাশ বিস্তর। আর এ কারণেই ঈমানের বৃদ্ধি, দৃঢ়তা ও সজীবতার দাওয়াত চলবে কিয়ামত পর্যন্ত।

এ এক অনিবার্য প্রয়োজন! দ্বীনের প্রতি স্বীয় ঈমান ও বিশ্বাসকে আরও মজবুত করতে হবে, আরও পোক্ত করতে হবে। দ্বীনকে গ্রহণ করতে হবে স্বীয় জীবন-দর্শন হিসেবে। জীবনের সকল কিছু উৎসর্গ করতে হবে ঐ দ্বীনের জন্য। পৃথিবীর কোন কিছুর বিনিময়েই বর্জন করা যাবে না এই দ্বীন, এই দর্শন, এই আদর্শ; বরং এই উম্মতের প্রতিটি সদস্যকে, প্রতিটি জাতি ও সম্প্রদায়কে এই দ্বীনের প্রতি নতুনভাবে ঈমান আনতে হবে, নতুনভাবে উপলব্ধি করতে হবে এই দ্বীনের দাবি ও পয়গামকে।

অভিজ্ঞতা ও দেখা সত্যের চেয়েও
অধিক সত্য নবীর পয়গাম

প্রিয়তম নবী (সা.)-এর নবুওয়াতের প্রভাতকালেও দ্বীনের কিছু কিছু বিষয় বিদ্যমান ছিল। কোথাও কোথাও নামায, হজ্জ ইত্যাকার ইবাদতের অস্তিত্ব ছিল। দ্বীনের অস্তিত্ব তখনো পরিপূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়নি। পুরাতন ধর্ম-চিন্তা, আসমানী দ্বীন-দর্শনের বিভিন্নরূপ তখনো নজরে পড়ত। কিন্তু যে জিনিসটা কোথাও পাওয়া যেত না সেটা হলো দ্বীনের শক্তি, আসমানী ধর্ম-বল।

তারা বিশ্বাস করতো, সাপের বিষ জীবন বিনাশ করে ফেলে; বিশ্বাস করতো বাতাস ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না; খাবার ছাড়া পেট ভরে না। এই জাতীয় অভিজ্ঞতাজাত আরও অনেক কিছুর প্রতিই তাদের আন্তরিক বিশ্বাস ছিল। কিন্তু দোযখের আগুন ভয়ংকর দুর্বিষহ– সে কথার প্রতি বিশ্বাস ছিল না। বেহেশ্‌তের বর্ণনাতীত অনুপম শান্তি-সুখের প্রতিও তাদের ঈমান ছিল না। তারা বিশ্বাস করতো না, আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে এই দুনিয়াতেও সফল হওয়া যায় না। অথচ তাদের চাকর-বাকররা তাদের অবাধ্য হলে তাদের ঘরে ঠাঁই পেত না।

তারা বিশ্বাস করতো না পাপ, অন্যায়, অবিচার জনবসতি থেকে শুরু করে রাজ্যকে পর্যন্ত ধ্বংস করে দিতে পারে। একজন চিকিৎসকের কথার প্রতি তাদের যতটা আস্থা ছিল, একজন নবীর কথার প্রতি ততটুকু আস্থাও ছিল না। এর কারণ হলো, দ্বীনের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাদের জীবনে কোন প্রাণ ছিল না। তারা জড় পদার্থের মতো হয়ে পড়েছিল, বরং এসব বিষয়ের প্রতি তাদের কোন আকর্ষণই ছিল না। তারা ভাবতো কেবল এই পার্থিব জীবন নিয়ে। এই পার্থিব জীবন এবং দেখা-শোনা অভিজ্ঞতার ছায়াগুলো প্রচণ্ড বাস্তবতা হয়ে তাদেরকে ঢেকে রাখতো সর্বদা।

প্রিয় বন্ধুরা!

যদি ভেবে দেখি তাহলে উপলব্ধি করতে পারবো, আমাদের বর্তমান অবস্থাও কিন্তু এর চেয়ে ব্যতিক্রম কিছু নয়। যদি এই মুহূর্তে কেউ এসে উচ্চৈঃকণ্ঠে ঘোষণা করে, 'চিড়িয়াখানা থেকে একটি বাঘ ছুটে গেছে,' তাহলে দেখবেন সকলের দৃষ্টি সেদিকেই নিবদ্ধ হবে। সকলেই নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়বে। এই প্রশান্ত মাহ্ফিলের শৃংখলা মুহূর্তে ঝাপটা-ঝড়ের মতো উড়িয়ে নিয়ে যাবে। ছুটে পালাবে সকলেই।

এর কারণ, জীবন ও জীবনের মমতা আমাদের গ্রাস করে আছে। তাই জীবনের প্রতি কোনরূপ আশংকার কথা শুনলেই আমরা চকিত হই; আমাদের শক্তিগুলো সতেজ হয়ে ওঠে। জীবনকে বাঁচাতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু কেউ যদি আমাদের সেই জীবনের আশংকার কথা বলে– যে জীবনের কোন শেষ নেই, পরকালের অনন্ত জীবন, যেখানে শাস্তি হলে সে শাস্তি হবে অসীম ও অনন্তকালভরে, আবার সুখ হলে তাও হবে অনন্তকাল অবধি। দেখা যাবে, এই সংবাদ শুনে আমরা চকিত হবো না, অস্থির হবো না, আমাদের ভাবান্তরও হবে না। এর কারণ এই নয় আমাদের মধ্যে দ্বীন নেই আসলে এর কারণ হলো, আমাদের ঈমানের কমতি, বিশ্বাসের দুর্বলতা বরং এক ধরনের বিশ্বাসহীনতা বলার অপেক্ষা রাখে না, ঈমান ও বিশ্বাসের এই শৈথিল্য, এই দুর্বলতা যতক্ষণ না কাটবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই জীবনের কোন দুঃসংবাদ, সেই জীবনের কোন আশংকাবোধ আমাদেরকে কম্পিত, শংকিত ও চকিত করতে পারবে না। কেননা, সে জীবন তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না। অথচ তা আমাদের স্থূল দৃষ্টির আড়ালে প্রতিষ্ঠিত এক জ্বলন্ত বাস্তবতা!

সাফা পর্বতে দাওয়াতের সূচনা

আল্লাহ তাআলা হুযূর আকরাম (সা.)কে যখন রাসূল নির্বাচন করলেন তখন আরবদের মধ্যে একটি রেওয়াজ ছিল। যদি কখনো এক কবিলা অন্য কবিলার ওপর হামলা চালাত, আক্রমণ করত তাহলে আক্রান্ত কবিলার কোন সদস্য আগন্তুক এই বাহিনীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়ে গিয়ে পর্বতে আরোহণ করতো এবং একেবারে উলঙ্গ হয়ে উচ্চৈঃস্বরে শত্রুর আগমনবার্তা ঘোষণা করতো। তাই তাকে আরবরা (النذير العريان) 'নাঙা সতর্ককারী' বা স্পষ্ট ভীতি প্রদর্শক বলতো। তার এই কাণ্ডের অর্থ হতো– শত্রু একেবারে মাথার ওপর এসে পড়েছে। সুতরাং যে যে অবস্থায় আছ সেই অবস্থাতেই প্রতিরোধের জন্য চলে আস।

আরবদের এই নিয়ম অনুযায়ী হযরত (সা.) একদিন এক পাহাড়ে আরোহণ করলেন। এবং স্বকণ্ঠে ঘোষণা করলেন 'আনান-নাযীরুল উরয়ান' আমি স্পষ্ট ভীতি প্রদর্শক। মক্কাবাসীরা হযরতকে (সা.) জানতো! হযরতের সততা ও সত্যবাদিতা সব কিছুই ছিল তাদের মুখে মুখে। তাই হযরতের মুখে এই আহ্বান শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তারা পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত হলো। তারা এই ডাকে সাড়া দিতে এক বিন্দু দেরি করেনি। কারণ তারা হযরতের এই আহ্বানকে নিশ্চিত কোন বিপদ-ঘন্টা মনে করে নিয়েছিল। তারা ভেবেছিল, কোন শত্রু হয়তো হামলা করবে আমাদের ওপর এবং হযরত মুহাম্মদ আমাদেরকে সেই সংবাদ-ই হয়তো দেবেন।

অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (সা.) বললেন, 'আমি যদি তোমাদেরকে বলি, এই পাহাড়ের পশ্চাতে শত্রু লুকিয়ে আছে, তোমরা তাদের দেখতে পাচ্ছ না। আমি যেহেতু পাহাড়ের উপরে দাঁড়ানো, তাই দেখতে পাচ্ছি। তাহলে কি তোমরা বিশ্বাস করবে? তারা তখন সকলেই এককণ্ঠে বলল ঃ নিঃসন্দেহে আমরা আপনার কথাকে বিশ্বাস করব। তারপর তিনি তাদের উদ্দেশে বললেন, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদেরকে শাস্তিদানের জন্যে আযাবের ফিরিশতাদের বিরাট বাহিনী তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, তারা বরং মাথার উপর দাঁড়ানো। তোমরা যদি আমার কথা শোন তাহলে এই ভয়াবহ বিপদ থেকে বাঁচতে পারবে।' একথা শুনতেই তাদের ভয়-শংকা সব কেটে গেল মুহূর্তে। তারা এখানে এসে যেন ঠকে গেছে এমন ভাব দেখিয়ে বলতে লাগল ঃ আপনি এই কথা বলার জন্য আমাদের ডেকেছেন? এ কি কোন কথা হলো?

এর মূল কারণ কী? আসল কারণ হলো, দুনিয়ার জীবন ও সম্পদের মোহে তারা ছিল অন্ধ। পার্থিব জীবনের যে কোন শংকাই তাদেরকে অস্থির ও বিচলিত করে তুলতো। অথচ পরকাল সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। তাই পরকাল সম্পর্কে তাদের কোন ভয় ও আশংকা ছিল না। সে সম্পর্কে ছিল তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে বিভিন্ন মাযহাব ও ধর্ম-মতের প্রচলন ছিল। তারাও নিজেদের ঈমানদার বলে দাবি করতো! কিন্তু তাদের ঈমান ও বিশ্বাস এত দুর্বল ও অসহায় ছিল, কল্পিত ও চিন্তাপ্রসূত অসার কার্যক্রম ও কুসংস্কারের পর্যন্ত মোকাবিলা করতে পারতো না। ঈমান তাদেরকে তাদের পছন্দের অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখতে পারতো না। সারকথা হলো, তাদের মধ্যে দ্বীন ছিল, ধর্ম ছিল। কিন্তু এত অসহায়, শক্তিহীন ও নিষ্প্রাণ যে, সামান্য কোন দুর্ঘটনার পর্যন্ত মোকাবিলা করতে পারত না।

অথচ আল্লাহর রাসূল (সা.) যে দ্বীনের পয়গাম নিয়ে এই পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন, সেই দ্বীনের অনুসারীদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁদের ঈমান ছিল বলিষ্ঠ-শক্তিমান। তারা এই পার্থিব জীবনের চেয়ে পরকালের জীবনকে অধিক প্রাধান্য দিতেন। তাদের চিন্তাজুড়ে সর্বদা বিরাজ করত পরকাল ভাবনা! তাদের ঈমান ও বিশ্বাস তাদের জন্য অনেক বড় বড় ত্যাগ ও কুরবানীর পথকে সহজ করে দিয়েছিল। দ্বীনের প্রকৃত আহ্বানের প্রতি তাদের আস্থা ও বিশ্বাস ছিল পর্বতসম দৃঢ়। তাদের ঈমান ছিল সদা তাজা ও প্রাণময়।

অন্য ধর্মাবলম্বীদের ঠিকাদার আর এই ঈমানদারদের মধ্যে পার্থক্য ছিল এমন– যেমন ফটো আর জীবন্ত মানুষের মধ্যে পার্থক্য হয়। আগুন আর আগুনের ছবির পার্থক্যের মত পার্থক্য ছিল উভয় শ্রেণীর ঈমান ও বিশ্বাসের।

নতুন এই বিশ্বাস, নয়া এই ঈমান সাহাবায়ে কেরামের (রা.) ধমনীতে এমন অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করেছিল– যারাই তাদের প্রতিরোধে নেমেছে, এই বিশ্বাস ও ঈমান থেকে বঞ্চিৎ যে শক্তিই তাদের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে মোমের তৈরি চিত্রের মতো গলে পড়ে গেছে। মাটির সাথে মিশে গেছে। কারণ, তাঁদের তলোয়ারে লোহার উষ্ণতা ছিল না– ছিল ঈমানের অগ্নি-পরশ। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর, ছেঁড়া বস্ত্রে আবৃত সেই মুজাহিদগণ অস্ত্রের বলে লড়তেন না, তাঁরা লড়তেন ঈমানের বলে। তাঁদের সামনে এ কারণেই বেঈমানরা দাঁড়াতে পারতো না বেশিক্ষণ।

তাঁদের বিশ্বাস ছিল, যদি পৃথিবীর সবগুলো তলোয়ার একটির পর একটি করে আমাদের গর্দানে পড়তে থাকে আর আল্লাহর আদেশ না হয় তাহলে কেউ আমাদের গর্দান উড়াতে পারবে না। আর যদি আল্লাহর হুকুম হয় তাহলে আমাদের গর্দান উড়াবার জন্যে তলোয়ারের একটি আঘাতই যথেষ্ট।

নতুন এই ঈমান গরিব আরবদের অন্তর থেকে দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের সকল অনুভূতি ও আশংকাবোধকে ঝেঁটিয়ে তাড়াল। তাঁরা বলীয়ান হয়ে উঠল ঈমানের বলে। তাই তাঁদের দূত যখন ইরানের রাজদরবারে হাজির হলো তখন তাঁর তলোয়ারের বুকটা ভাঙ্গনের শিকার। তাঁর ঘোড়া নেহাৎ ছোট্ট। কিন্তু তাঁর ঈমান অনলতপ্ত। অগ্নিদীপ্ত ঈমানের বলেই তিনি নিজেকে সকল শক্তির উপরে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। যে কারণে, ইরানের রুস্তম পাহ্লোয়ান পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। ইরানী শাহী দরবারের সকলেই নিজের সম্পর্কে আশংকাবোধ করতে শুরু করেছিল। সকল দরবারীর ভেতরই প্রচণ্ড ঝড় বইছিল তখন। মূলত এই নতুন ঈমানের শক্তিতেই এই যোদ্ধা-দূত প্রচণ্ড বীরত্ব ও শংকাহীন ভঙ্গিতে দরবারের কালিন মাড়িয়ে ঘোড়ায় চড়ে সিংহাসনের সন্নিকটে চলে গিয়েছিলেন। স্বীয় বর্শাটি গেড়ে দিয়েছিলেন শাহী তখতে।

প্রকৃত ঈমান

এই ঈমানের পার্থক্যের কারণেই দেখা গেছে, হযরত (সা.)-এর আবির্ভাব কালে পৃথিবীতে নামায ছিল। কিন্তু তাতে আত্মবিশ্বাস-ভীতি ও প্রীতি এবং খুশু ও খুযুর স্পর্শ ছিল না। হজ্জ ছিল। তবে তাতে রূহ ছিল না। ছিল নিষ্প্রাণ আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। কিন্তু যখন মানুষ হযরত (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল, তাঁর ডাকে সাড়া দিল তখন তাঁদের মধ্যে এমন ঈমান সৃষ্টি হলো, শুধু হজ্জ ও নামাযের সময়-ই নয়, বরং অন্য সময়ও তাঁদের ওপর হজ্জ ও নামাযের অবস্থা ছেয়ে থাকতো। মনে হতো সারাক্ষণ তাঁদের দৃষ্টিতে ভেসে বেড়াচ্ছে আল্লাহ ও আখিরাত। এই দুনিয়াতে বসেই তাঁরা বেহেশতের সুগন্ধি পর্যন্ত পেতে শুরু করেন। ঈমানের সে এক বিস্ময়কর জীবন্ত চিত্র।

এক সাহাবীর কথা

এক যুদ্ধের ঘটনা। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) যুদ্ধের ময়দানে এক সাহাবীকে বললেন, অমুকের একটু খোঁজ নিয়ে দেখ তো! একটু দেখে এসো সে কেমন

আছে। সাহাবী সতীর্থ বন্ধুকে খুঁজতে বেরুলেন। খুঁজতে খুঁজতে রণাঙ্গনের এক স্থানে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে দেখতে পেলেন এবং ছুটে গেলেন কাছে। তখন তাঁর একেবারে শেষ সময়। কাছে গিয়ে বললেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) আপনার অবস্থা জানতে চেয়েছেন। সাহাবী উত্তর দিলেন, নবীজীকে আমার সালাম বলো আর বলো, আমি বেহেশতের সুগন্ধি পাচ্ছি।

হযরত আবু হুরায়রার ঘটনা

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (র)। জীবন-সায়াহ্নে উপনীত। অসুস্থ। খুব কষ্ট হচ্ছে। পাশেই উপবিষ্ট জীবনসঙ্গিনী। স্বামীর কষ্ট দেখে তার মুখ থেকে অজ্ঞাতে বেরিয়ে এল, 'আহ্ কী কষ্ট! যখন হযরত আবু হুরায়রার জ্ঞান ফিরল তখন তিনি বললেন, কি বলছো? ওয়া কারাবাহ্! আহ্, কী কষ্ট!' না, না! বরং বল— واطرباه واطرباه - غدا القى الأحبة محمدا وحزبه —

'আহা! কী আনন্দের সময়; আহা! কী আনন্দের সময়।

কাল মিলিত হবো বন্ধুদের সাথে; মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর দলের সাথে।"

অর্থাৎ দেখা জিনিসের প্রতি আমাদের বিশ্বাস যেমন দৃঢ় ও কঠিন, দ্বীন ও ইসলামের হাকীকতের প্রতি তাঁদের ঈমান ছিল ঠিক তেমনই দৃঢ় ও কঠিন। কারণ, তাঁদের ঈমান ছিল নয়া, তাজা এবং প্রাণবন্ত। আর যেকোন নতুন জিনিসের মধ্যেই এক ধরনের শক্তি, সজীবতা ও প্রাণময়তা থাকে।

হযরত আবু যর গিফারীর (রা.) ঘটনা

হযরত আবু যর গিফারী (রা.) নবীজীর খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তখন তাঁর মধ্যে সত্যের প্রকাশ ও ঘোষণা দানের প্রেরণা উথলে উঠল। অথচ তখন এটা ইসলাম দুশমনদের দৃষ্টিতে এক বিরাট বড় অপরাধ! হযরত আবু যর (রা.) তাদের মধ্যে দাঁড়িয়েই সুউচ্চ স্বরে বুলন্দ কণ্ঠে 'কালিমা' উচ্চারণ করলেন। কাফের-বেঈমানরা চার দিক থেকে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল! প্রহার করল নির্মমভাবে।

কিন্তু হযরত আবু যর (রা.) সেই আঘাতে নির্মম নির্যাতনে এমন অলৌকিক অনিবচনীয় স্বাদ ও পুলক অনুভব করলেন– যার টানে দ্বিতীয় দিন গিয়ে পুনরায় হাজির হলেন সেখানে। প্রহৃত হলেন, নির্যাতিত হলেন পুনর্বার। মূলত এই ছিল

নয়া ঈমানের ডাক, নয়া ঈমানের আহ্বান। তাজা, সজীব ও প্রাণবন্ত এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে কেউ যখন দ্বীনের পথে নেমে আসে তখন প্রতিটি কষ্ট ও আঘাতই তার কাছে এক অলৌকিক স্বাদ ও মধু নিয়ে হাজির হয়।

হযরত আবদুল্লাহ (রা.)

সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ যুলবাজাদাইন (রা.)! ইসলাম গ্রহণের আগে বাবা মারা যাওয়ার কারণে থাকতেন চাচার কাছে। তার কাজ-কাম করতেন। ছাগল চরাতেন। ডাক পেলেন ঈমানের। ইসলামের আহ্বান পেলেন। একদিন সিদ্ধান্ত নিলেন, আজ মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে দেখা করে ইসলাম গ্রহণ করবেন। তারপর চাচার কাছে এসে ছাগলের পাল চাচাকে বুঝিয়ে দিলেন এবং বললেন, চাচা! আজ থেকে আমি আর আপনার রাখালী করব না। আমাকে এই দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিন। আমি ইসলাম গ্রহণ করতে যাচ্ছি। চাচা বললেন, তোমার গায়ে যে চাদর আছে ওটা আমার। ওটা খুলে রেখে যাও। জালেম তাঁর গায়ের সবকটি কাপড় খুলে রেখে একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় ছেড়ে দেয়। কোনক্রমে তিনি তাঁর মায়ের কাছে পৌছেন। পরনের কাপড় চান। মা একটা কম্বল এনে দেন। সেটাকেই দু'ভাগ করে এক ভাগ পরিধান করে আরেকভাগ গায়ে জড়িয়ে এসে হাজির হোন নবীজীর খেদমতে। অতঃপর অবশিষ্ট জীবন কাটিয়ে দেন হযরতের (সা.) কদমের কাছে! যেহেতু তিনি দুটি কম্বলকে সম্বল করে বেরিয়ে এসেছিলেন, এই কারণে তাঁর উপাধিই পড়ে যায় বাজ্জাদাইন অর্থাৎ দুই কম্বলওয়ালা।

তাজা ঈমানের আকর্ষণ

প্রিয় ভায়েরা!

নতুন ঈমানের স্বাদই ভিন্ন। তাজা ঈমানের আকর্ষণই আলাদা। নতুন ও তাজা ঈমানের কাছে এই পার্থিব জগৎ মূল্যহীন। এই তাজা ঈমানের পরশ যে পেয়েছে সে সঙ্গে সঙ্গেই দা'ঈ ও মুজাহিদ হয়েছে।

এক যুদ্ধের কথা। রোমক সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে। শত্রুপক্ষের সারি থেকে এক বীরযোদ্ধা বেরিয়ে এলো। হযরত খালিদ ইবন্ ওলীদ (রা.)-কে চিৎকার করে ডাকল। তিনি এগিয়ে গেলেন। সে তখন যুদ্ধ না করে তাঁকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করল। অবশেষে বলল, তোমাদের ধর্মে প্রবেশ করার নিয়ম কি? হযরত খালিদ (রা.) সকল প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পর তাকে স্বীয়

তাঁবুতে নিয়ে এলেন, গোসল করালেন এবং কালিমা পড়িয়ে মুসলমান করে নিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর সে দুই রাকাত নামায আদায় করল। তারপর ফিরে এলো যুদ্ধের ময়দানে এবং অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসের সাথে যুদ্ধ করতে শুরু করল আল্লাহর পথে। অবশেষে শাহাদাতবরণ করল।

এই হলো নতুন ঈমানের আকর্ষণ, তাজা ঈমানের উষ্ণতা। হযরত খালিদ রণাঙ্গন থেকে এক শত্রুকে ধরে এনে ইসলামের খাদেম বানিয়ে দিলেন। আর সেও ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই ইসলামের জন্য নিজের জীবনটাকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন।

আমাদের আহ্বান

বন্ধুরা!

আমরা মূলত এই ঈমানের প্রতিই ডাকছি। আমাদের আহ্বান ঈমানের এই শক্তি অর্জনের প্রতি। আমরা বলি, আমাদের এমন ঈমান সৃষ্টি করতে হবে, যাতে আমাদের চারপাশের বন্ধুরা সেই ঈমানের খোশবুতে সুবাসিত হতে পারেন, আমোদিত হতে পারেন। ফুলে যদি সুগন্ধি থাকে তাহলে তা অনুভূত হবেই। আগুনের উষ্ণতা সহজেই ধরা পড়ে। অনুরূপভাবে আমাদের ঈমানে যদি সুবাস থাকে, উষ্ণতা থাকে তাহলে অন্যেরা এর দ্বারা অবশ্যই প্রভাবিত হবে। আমাদের ঈমান যদি সুবাস না ছড়ায়, অগ্নি বিচ্ছুরণ না করে তাহলে অন্যদের প্রতি অভিযোগ করে কী লাভ হবে।

হিমসে মুসলমানদের জয় হলো। সেখানে কর আদায় করা হলো। ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু হলো। কিন্তু তার অল্প ক'দিন পরই সমকালীন খলীফা আদেশ পাঠালেন, হিমস ছেড়ে অন্যত্র চলে যাও। হিমসের শাসনকর্তা যখন খলীফার নির্দেশে হিমস ছাড়ছেন, তখন একটি পাই পাই করে হিসাব করে আদায়কৃত করের টাকা ফেরত দিয়েছেন। এ ছিল তাঁর ঈমান। তখন হিমসের ইহুদী-খৃস্টানরা এদ্বারা তাঁর ঈমানের গন্ধ পেল। সুবাসিত ঈমানের গন্ধে তারা এতটা মোহিত হল– মুসলমানগণ যখন হিমস ছাড়ছিলেন তখন ইহুদী-খৃস্টান কাঁদছিল আর বিদায় জানাচ্ছিল। তাদের জন্য মঙ্গল কামনা করে দু'আ করছিল। বলছিল, আল্লাহ তোমাদেরকে পুনরায় ফিরিয়ে আনুন। আজ মূলত প্রয়োজন এই ঈমান, এই ঈমানী শক্তি। অর্থ নয়, আত্মিক শক্তি ও চারিত্রিক বড়ত্ব। তাহলেই অন্যেরা আমাদের ঈমানের সুরভিত গন্ধে আলোড়িত হবে।

আজ মুসলমানদের কাছে অর্থ-বিত্ত, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি কোনটিরই অভাব নেই। যার অভাব, যে কারণে মানুষের দৃষ্টি বদলে গেছে এবং যে কারণে চলমান পৃথিবীর দৃষ্টিতে মুসলমানদের কোনই মূল্য নেই তা হলো–ঈমানের সজীবতার অভাব, নতুনত্বের অভাব। প্রাণ ও সতেজতা নেই ঈমানে এবং এই অভাব কিংবা শূন্যতার প্রভাব তখন থেকেই প্রকাশ পেতে শুরু করেছে, যখন মুসলমানদের হাতে ক্ষমতা ছিল। তারা জাঁকজমকের সাথে রাজত্ব করতো তখন।

বনু উমায়্যার শাসনামলের কথা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এক অমুসলিম করদাতা রাজ্যে কর আদায় করতে গিয়েছে সরকারি তহসিলদার। এবং এই প্রথমবার ইসলামী রাষ্ট্রের কর আদায়কারী কর্মকর্তা সরকারি শান-শওকত অবস্থা-ব্যবস্থাসহ কোন রাষ্ট্রে কর আদায় করতে যায়। তাদের এই অফিসারসুলভ বেশ-ভূষা দেখে সে এলাকার শাসক বলল, আল্লাহর সেই বান্দারা কোথায়, যারা এর আগে কর আদায় করতে আসত? যাঁরা ঘাসের তৈরি মোটা পোশাক পরিধান করতো। যাদের মুখ থেকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা আর পরিধেয় থেকে দারিদ্র্য ঠিকরে পড়তো। তাকে জানানো হলো, তাঁরা তো প্রথম যুগের মুসলমান। সেই পুরানা যুগের মুসলমান এখন কোথায় পাবেন? তখন সে এলাকার শাসক বলল, তাহলে আমরা এক পয়সাও কর দেব না। এত দিন তো আমরা তাঁদের ভয়ে যাকাত দিতাম। তাঁরা এসে যখন বলতেন, আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহ যা দিতে বলেছেন তা দিয়ে দাও। তখন আমরা তাঁদের কথা ফিরিয়ে দিতে পারতাম না। ভয় হতো। কিন্তু তোমাদের তো ভয় করার কোন কারণ নেই। আমরা কর দেব না। এখন তোমরা যা পার কর গিয়ে।

তরতাজা ঈমান সময়ের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন

আজ পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো তরতাজা ঈমানের। যে ঈমান মানুষের পূর্ণ জীবন ও কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করবে। নিজের অনুগত করে নেবে। সেই ঈমান আজ কোথাও নেই। এর বাইরে সবই আছে। ইউরোপের কারখানাগুলো দেখুন! মানুষের যা প্রয়োজন তা তো পুরোপুরি তৈরি হচ্ছেই– এমনকি যার কোনই প্রয়োজন নেই তাও তৈরি হচ্ছে। অতঃপর যার যেটা প্রয়োজন বাজার থেকে সংগ্রহ করে নিচ্ছে। কিন্তু ইউরোপের কারখানা যেটা তৈরি করতে পারে না

সেটা হলো খালিদ (রা.) ও আবু যরের (রা.) ঈমান। এবং এ কারণেই ইউরোপ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, তারা সব পারলেও এই পৃথিবীকে অন্যায় ও অপরাধ থেকে মুক্ত ও পবিত্র করতে অক্ষম। বড় বড় চরিত্র ও মনোবিজ্ঞানীরা যেখানে জঘন্যতম অপরাধের শিকার, চারিত্রিক ব্যাধিতে গ্রস্ত, সেখানে অন্যদের শোধরাবার পথ কোথায়? ইউরোপের এক চরিত্র ও মনোবিজ্ঞানীর কথা যিনি প্রতি বছর তার সেবা গ্রহণ করার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করতেন– তিনিই একবার এক মহিলার গলা থেকে হার চুরি করার সময় পাকড়াও হন। এই 'চার্চিল ট্রুমানম্যান'ই যদি সমগ্র পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তার পাহারাদার নিযুক্ত হন এবং সুযোগমত যদি ব্যক্তিগত ক্ষমতা কিংবা জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক ক্ষমতা দখল করার লক্ষ্যে এটম বোমা মেরে দেশের পর দেশ ধ্বংস করে দেয়– যেমনটি গত লড়াইয়ে জাপানের দুটি নিরপরাধ শিল্প নগরীর সাথে করা হয়েছে তাহলে আশ্চর্য হবার কী আছে!!

বন্ধুরা!

আমি কিন্তু নতুন কোন ধর্মের দিকে ডাকছি না। নতুন কোন দ্বীনের কথাও বলছি না। তবে এক নতুন ও তাজা ঈমানের দাওয়াত অবশ্যই দিচ্ছি। আমি বলছি, আমাদের ঈমানকে তাজা করতে হবে, নতুন করতে হবে। স্বয়ং আল্লাহ তাআলাও কুরআনে কারীমে বলেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا آمِنُوْا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমান আন। [নিসা ঃ ১৩৬]

হযরত রাসূলে কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন– جَدِّدُوْا إِيْمَانَكُمْ 'তোমরা তোমাদের ঈমানকে নয়া কর, নবায়ন কর।'

আমরা মূলত এরই দাওয়াত দিচ্ছি আমি বরং পরিষ্কার ভাষায় বলছি, আমরা, আমাদের যারা বুযুর্গ, বড় বন্ধু এবং ছোট সকলেই এর মুহ্তাজ। আমাদের সকলের ঈমানই তাজা করা দরকার, নতুন করা দরকার, যেমনটি ছিল আমাদের পূর্বপরুষদের ঈমান। আমাদের এই ভারতবর্ষের সেই মহান দাঈ ও মুজাদ্দিদ যিনি মানুষকে ঈমান তাজা ও নতুন করার দাওয়াত দিতেন তাঁর আমলেও কিন্তু এখানে ঈমান ছিল, ইসলাম ছিল, আলেম ছিল, বুযুর্গ ছিল, সবই ছিল। কিন্তু তিনি যখন নয়া ঈমানের দাওয়াত নিয়ে উঠেছেন তখন উম্মতের মধ্যে ঈমানদীপ্ত নতুন জীবনের সূচনা হয়েছে। অতঃপর যারা আগে কেবল নামে মুসলমান ছিলেন

পুনরায় ঈমানের নতুনত্বে শাণিত হয়ে উঠেছেন তখন তাদের মাধ্যমেও ইসলামের প্রথম যুগের অনুরূপ ইতিহাস সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। তাজা হয়ে উঠেছে আমাদের মৃত ইতিহাস এবং প্রমাণিত হয়েছে, সত্যিই ঈমানে অনেক শক্তি থাকে এবং সেই শক্তি যে কোন যুগেই জাগিয়ে তোলা যায়।

এখন পৃথিবীর সবকটি মুসলিম দেশেই ঈমানী ডাকের প্রতিধ্বনি হচ্ছে। তুরস্ক, মিসর, হিজায সর্বত্রই ঈমানকে বাড়িয়ে তোলার, শাণিত করার প্রয়াস চলছে এবং সেই প্রয়াস সর্বাধিক জরুরি আমাদের দেশে। প্রয়োজন ঈমানকে নতুন বিশ্বাসে দীপ্ত করে তোলা এবং এই আহ্বানকে সর্বত্রই ছড়িয়ে দেয়া। আবারও বলি, আমাদের পুরাতন ঘুণে খাওয়া ঈমান জীবন পথের সমস্যাবলীর মোকাবিলা করতে অক্ষম। ছোটখাটো সমস্যা হলে দুর্বল ঈমানের পক্ষে সেটা জয় করা সম্ভব হয়। কিন্তু কঠিন ও অসম পরিস্থিতিকে জয় করার জন্যে প্রয়োজন প্রত্যয়কঠিন বজ্র ঈমান। যে ঈমানের বল ও শক্তি হবে সকল বস্তু শক্তির উর্ধ্বে। বিশ্বময় মুসলমানরা এখন কঠিনতর অবস্থার শিকার। সে কারণে আমাদের ঈমান ও অসম্ভব সতেজ ও দীপ্ত হতে হবে। আমাদের জীবনে আনতে হবে বিপ্লবী পরিবর্তন। ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানদের বিশ্বাস, চেতনা ও প্রেরণায় গড়ে তুলতে হবে আমাদের ঈমান, বিশ্বাস ও জীবন। অবস্থার পরিবর্তন আর পরিস্থিতি কব্জায় আনার জন্য এটাই সবচে হয় বড় প্রয়োজন এবং এটাই কেবল বাকি।

সূরত এবং হাকীকত

আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে অনেক বড় ব্যবধান

যেকোন জিনিসের দুটি দিক থাকে। একটি তার বাহ্যিক সূরত ও আকৃতি, অপরটি হলো তার হাকীকত ও প্রকৃতি। এই দুইটির মধ্যে সাদৃশ্য যেমন সুস্পষ্ট, আবার উভয়ের মধ্যে দূরত্ব ও ব্যবধানও অনেক বড়। উভয়টি যেমন একে অপরের খুবই কাছাকাছি, আবার অনেক দূরেও। আপনি প্রতিদিনকার জীবনচিত্রে এর অনেক উপমা রীতিমতোই লক্ষ করে থাকবেন। তবুও বিষয়টি আরেকটু খোলাসা করার জন্য আমি এর দুটি উপমা পেশ করছি।

আপনি মাটির তৈরি নানা রঙের ফল দেখেছেন নিশ্চয়। দেখতে কিন্তু ওসব ফল একেবারে প্রকৃত ফলের মতোই মনে হয়। অথচ এর বাহ্যিকরূপ আর প্রকৃতরূপের মধ্যে আসমান-জমিন ব্যবধান। বৃক্ষশাখায় উৎপাদিত আমই ভিন্ন আর মাটির তৈরি আমই ভিন্ন। মাটির তৈরি আম দেখতে আমের মতো মনে হলেও এতে না আছে স্বাদ, না আছে গন্ধ, না আছে রস, না আছে তারল্য, না আছে আমের কোন বৈশিষ্ট্য। দেখতেই কেবল ওটা আম। তার রঙ ও রূপে হয়তো আপনিও তাকে আমই বলবেন। কিন্তু মাটির আম মাটির তৈরি। এই আম কেবল দৃষ্টির শোভা। এটা খাওয়ার জন্য নয়, গন্ধ নেয়ার জন্য নয়, স্বাদ আস্বাদনের জন্যও নয়।

আপনি হয়তো জাদুঘরে গিয়েছেন কখনো। সেখানে নিশ্চয় যতসব ভয়ংকর হিংস্র প্রাণীর সমাহার লক্ষ করেছেন। সেখানে কী নেই? বাঘ আছে। হাতি আছে। চিতা আছে। ভল্লুক আছে। তবে কেবল রূপ। হাকীকত নেই। বাহ্যত বাঘ। অথচ ভেতরে তার ভূষি বোঝাই। উপরে বাঘের চামড়ার আস্তরণ। এই বাঘ কেবল ঘর সাজাবার বাঘ। এতে প্রাণও নেই, শক্তি-পাঞ্জা কোনটাই নেই বাঘের। দেখতে অবিকল বাঘ। অথচ তার না আছে বাঘের হুংকার, না আছে বীর্য, না আছে রোষ-রাগ, না আছে বাঘের ব্যাঘ্ররূপ।

হাকীকতের কাছে সূরতের পরাজয়

আমি যে কথা বলতে চাই তাহলো, সূরত ও বাহ্যরূপ কখনো হাকীকত এবং প্রকৃত শক্তির মোকাবিলা করতে পারে না। শিল্পের ছোঁয়ায় উন্নীত কোনরূপ বাহ্যিক আকৃতির মধ্যে কখনো প্রকৃত জিনিসের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় না। সূরত কখনো হাকীকতের সাথে যুদ্ধ করতে পারে না, জয়ী হতে পারে না হাকীকতের বিরুদ্ধে। সূরত কখনো হাকীকতের ভার বহন করতে পারে না। সূরত যদি কখনো হাকীকতের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয় তাহলে তাকে পরাজিতই হতে হবে। কোন সূরতের ওপর যদি হাকীকতের বোঝা তুলে দেয়া যায় তাহলে তা মাটির সাথে মিশে যাবে, আপন অস্তিত্ব হারিয়ে বসবে।

সূরত ও হাকীকতের এই ব্যবধান সর্বত্রই দৃশ্যমান। সর্বত্রই সূরতকে হাকীকতের সামনে পরাজিত হতে হয়। এমনকি বিশালকায় কোন সূরতের বিরুদ্ধেও যদি ছোট্ট ও ক্ষুদ্র কোন হাকীকত দাঁড়িয়ে যায় তাহলেও পরাজিত হতে হবে সূরতকেই। বিজয় হবে হাকীকতের। কারণ অতি ক্ষুদ্রকায় একটি হাকীকতও শক্তিতে, বীরত্বে, সাহসে, বিজয়ে বৃহৎকায় অনেক সূরতের চেয়ে বড়।

হাকীকত হলো একটি প্রকৃত সমৃদ্ধ অস্তিত্ব। একটি বাস্তব শক্তি। আর সূরত হলো একটি কল্পনামাত্র। একটি দুর্বল দুগ্ধপায়ী শিশু ও ভূষিভর্তি একটি নকল বাঘকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারবে। ধরাশায়ী করতে পারবে। কারণ বাচ্চাটি যত ছোটই হোক, তার ভেতর হাকীকত আছে। বাস্তব শক্তি আছে। আর বাঘটি দেখতে যত বড়ই হোক সে একটি সূরত মাত্র। একটি ব্যাঘ্রচিত্র মাত্র। তাই এই সূরত ও চিত্রবাঘ একটি দুর্বল শিশুর কাছেও পরাজিত হতে বাধ্য।

নফসের ধোঁকা

এই পৃথিবীটা হলো কিছু হাকীকতের সমষ্টিরূপ। আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুকেই হাকীকতসমৃদ্ধ করে সৃষ্টি করেছেন। সম্পদের মধ্যে হাকীকত দিয়েছেন। স্বভাবগতভাবেই মানুষ সম্পদকে ভালবাসে। সম্পদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। যদি সম্পদের মধ্যে কোন হাকীকতই না থাকতো তাহলে সম্পদ সম্পর্কে এত বিধি-নিষেধ কেন? তার প্রতি এত উথলে ওঠা আকর্ষণ কেন?

সন্তানও একটি হাকীকত। তাই মজ্জাগতভাবে মানুষ সন্তানকে ভালবাসে, সন্তানের সাথে তার নিগূঢ় বন্ধন। সন্তান যদি কোন হাকীকত-ই না হতো তাহলে

ইসলামে সন্তান লালন-পালন সম্পর্কে এত আইন-কানুন কেন? সন্তানের প্রতি যত্ন ও তার শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি এত গুরুত্বারোপ কেন? কেন এসবের এত মর্যাদা? মানুষের প্রাকৃতিক আবেদন, শারীরিক কামনা-বাসনাও একটি হাকীকত। হাকীকত বলেই তাকে নিয়ে জগৎ সংসারে কত আয়োজন, কত ঘটন-অঘটন।

আমরা আগেই বলেছি, কোন সূরত কোন হাকীকতকে পরাজিত করতে পারে না। অবশ্য হাকীকত সহজেই যে কোন সূরতকে পরাজিত করতে পারে। কিন্তু যদি হাকীকতে হাকীকতে লড়াই হয় তখন ছোট হাকীকত পরাজিত হয় বড় হাকীকতের কাছে এবং এটাই স্বাভাবিক। আর এ কারণেই পার্থিব এই জগতের মধ্যে যত রকমের হাকীকত আছে এই সমস্ত হাকীকতকে পরাজিত করতে হলে চাই এক অতি উন্নত শক্তিশালী হাকীকত। কোন সূরত তার মোকাবিলা করতে পারবে না।

হাকীকত চাই যত বাতিল ও ভ্রান্তই হোক না কেন তাকে জয় ও পরাজিত করতে হলে প্রয়োজন আরেক হাকীকত। ঈমানের হাকীকত, ইসলামের হাকীকত, বিশ্বাসের হাকীকত, ধর্ম ও চিন্তার হাকীকত। ইসলামের বাহ্যিকরূপ যতই পবিত্র হোক না কেন, তার দ্বারা এইসব হাকীকতকে জয় করা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ, একদিকে হাকীকত, অন্যদিকে সূরত। একদিকে আকৃতি, অন্যদিকে প্রকৃতি।

সত্যি করে বলতে গেলে বর্তমান পৃথিবীতে আমরা এই দৃশ্যই দেখছি প্রতিদিন। আমরা দেখছি, ইসলামের সূরত ও বাহ্যরূপ ছোট ছোট হাকীকতের সাথেও কুলিয়ে উঠতে পারছে না। জয়ী হতে পারছে না। কারণ, সূরতের মধ্যে কোন শক্তি নেই, বীর্য নেই। আমাদের এই সূরত ও বাহ্য ইসলাম, রূপমাত্র কালিমা, রূপমাত্র নামায, রূপমাত্র রোযা আমাদের সামান্যতম কামনা থেকেও বিরত রাখতে পারছে না। আমাদের ছোট-খাটো অভ্যাসকেও পরাজিত করতে পারছে না। এসব রূপমাত্র ইবাদত আমাদের সামান্য মৌসুমী বৈরিতা ও সামান্যতর রিপু ও নফসের চাহিদাকে মোকাবিলা করার শক্তিও জোগাচ্ছে না।

আমরা জানি, এই সামান্য একটি কালিমাই তো এক সময় গর্দান বিসর্জন দেয়ার মত শক্তি রাখতো! এই কালিমাই তো এক সময় আল্লাহর পথে সন্তান-সন্ততি অকাতরে বিলিয়ে দেবার হিম্মত ও মনোবল রাখতো। এই কালিমা এক সময় স্বীয় মাতৃভূমি ছাড়ার শক্তি যোগাত, ফাঁসির মঞ্চে তুলে ধরতো তার বাহককে অকুণ্ঠচিত্তে। আর আজ! আজ সেই কালিমা সামান্য শীতের মৌসুমে

নামাযের জন্য গরম বিছানা থেকে তুলে আনতে পারে না। যে কালিমা সারা জীবনের অকৃত্রিম বন্ধু শরাবকে শরীয়তের একটি নির্দেশের ইশারায় মুহূর্তে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, পরিণত করেছে শত্রুতে, আর আজ একান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এই কালিমা আপনাকে আপনার একটি সামান্য শখের আয়োজন থেকেও সরিয়ে আনতে পারে না।

এর মূল কারণ হলো, সে ছিল কালিমার হাকীকত। হাকীকত কালিমার সেইসব অলৌকিক অবদানকেই আমরা ইতিহাসের পাতায় পড়ি। আর এ হলো কালিমার সূরত, যা আমরা প্রতিদিন অনুক্ষণ লক্ষ করি, অবলোকন করি।

কিন্তু আমরা ভুল যেটা করি তাহলো, সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাসকে নিজেদের গায়ে জড়াতে চাই। তাঁদের ইতিহাসের রূপকে আমাদের জীবনে ছড়াতে চাই। উভয় জীবনকে আমরা এক করে দেখতে চাই। তাঁদের জীবন পোশাক কি আমাদের গায়ে ফিট হবে? হবে না, হয়ও না। তাই তাঁদের ইতিহাস ও জীবনধারার আলোকময় পোশাকে যখন নিজেদের আবৃত করতে চাই এবং স্থানে স্থানে ঝুল পড়ে যায়, কোথাও অতিরিক্ত ঢিলে, কোথাও সংকীর্ণ দেখতে পাই তখন অভিযোগ করি, তাজ্জব করি, বলি– আহা! এমন হলো কেন? তাঁরাও কালিমা পড়তো, আমরাও কালিমা পড়ি। তারাও নামায পড়তো, আমরাও নামায পড়ি। তাহলে তাঁদের জীবনে যে অলৌকিক ও বিস্ময়কর ঘটনারাজির বিকাশ ঘটতো সেটা আমাদের জীবনে ঘটে না কেন? তাঁরা যেসব অলৌকিক ফল ও ফসল লাভ করতো আমরা তা পারি না কেন?

বন্ধুরা!

অযথাই নিজেদের ধোঁকায় ফেলো না! তাঁদের মধ্যে তো কালিমার হাকীকত ছিল আর এখন আছে সূরত। তাঁদের মধ্যে ছিল ঈমানের হাকীকত, আর এখন আছে ঈমানের চিত্র। তাদের মধ্যে ছিল নামাযের হাকীকত, এখন আমাদের মধ্যে আছে নামাযের ছবি। যেভাবে তেঁতুলের বিচি থেকে আমফল আশা করা অর্থহীন; বোকামি, তেমনি ছবি ও সূরত থেকে হাকীকতের বৈশিষ্ট্য ও অবদানের আশা করাও অনর্থক ও নফসের ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইসলামের হাকীকত

আপনি নিশ্চয় হযরত খুবাইব (রা.)-এর ঘটনা শুনেছেন? তাঁকে শূলে চড়ানো হয়েছে। চারদিক থেকে তীর-বর্শা তাঁকে জর্জরিত করতে আরম্ভ করেছে। খাবলে খাবলে আলাদা করে নিচ্ছে তাঁর শরীরের তাজা গোশত। ধৈর্য ও সাহসের সাথে তিনি মোকাবিলা করে যাচ্ছেন নির্যাতনের। ভয়ংকর এই নির্যাতনের সময়ই তাঁকে বলা হলো, যদি তোমার স্থানে এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্থাপন করা হয় তাহলে কি তুমি রাজি আছো? তিনি ব্যথিত কণ্ঠে প্রত্যয়ের সাথে উত্তর দিলেন– এ তো অনেক বড় কথা! যদি আমাকে ছেড়ে দেয়া হয় আর তার পরিবর্তে হযরত (সা.)-এর পায়ে একটি কাঁটাও ফোটে আমি তাতেও রাজি নই।

আপনারাই বলুন, একি ইসলামের সূরত ছিল? ইসলামের ছবি ও চিত্রই কি হযরত খুবাইবকে শূলের মঞ্চে এই পাহাড়ময় দৃঢ়তা দান করেছিল, মুখে উচ্চারণ করবার ক্ষমতা দিয়েছিল এই প্রত্যয় কঠিন পবিত্র বাক্য? না! এ ছিল ঈমানের হাকীকত। এ ছিল ইসলামের হাকীকত। এই হাকীকত-ই তাঁদের সকল যন্ত্রণা, সকল নির্যাতন, সকল ঘা ও ক্ষতে সান্ত্বনার, ধৈর্যের ও জয়ের প্রলেপ মেখে দিত। এই হাকীকতই বর্শার প্রতিটি আঘাতের মুহূর্তে তাঁদের চোখের সামনে বেহেশতের চিত্র এনে তুলে ধরতো। বলে দিত, তোমার এই কষ্ট, এই যন্ত্রণা তো কয়েক মুহূর্তের জন্য মাত্র। অথচ এর অনন্ত-অসীম প্রতিদান বেহেশতে তোমার জন্যে অপেক্ষমাণ। আল্লাহর রহমত নেয়ামত তোমার পথ চেয়ে আছে। তুমি যদি নশ্বর এই বদনের ওপর বয়ে চলা এই কষ্টকে বরণ করে নিতে পার তাহলে অবিনশ্বর অনন্ত অসীম সুখ ও শান্তি ভোগ করবে তুমি খোদার বেহেশতে। এই ছিল মুহব্বত ও ভালবাসার হাকীকত। তাই যখন তাঁকে বলা হয়েছিল, তোমার স্থানে আল্লাহর রাসূলকে স্থাপন করতে কি তুমি প্রস্তুত? তুমি কি রাজি? তখন তাঁর সামনে হযরত (সা.)-এর পবিত্র চেহারা মোবারক বাস্তবরূপ ধরে উপস্থিত! তাই তিনি বরদাশ্‌ত করতে পারেননি, তাঁর পবিত্র কদমে একটি কাঁটা পর্যন্ত ফুটবে!

এই ছিল কিছু পবিত্র ও সম্মানিত বাস্তবতা ও হাকীকতের উপমা যা খুব সহজেই কষ্ট, যন্ত্রণা ও নির্যাতনের হাকীকতকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিল। কারণ, তাঁদের ইসলাম ছিল হাকীকত। ইসলামের সূরত, রূপ ও ছবির মধ্যে কোন কালেই কোন হাকীকতকে পরাজিত করার ক্ষমতা ছিল না, এখনও নেই। ইসলামের কৃত্রিম কষ্ট রূপ তো দূরের কথা কষ্টের কল্পনাকেও মোকাবিলা করতে

অক্ষম। আমরা কিছুকাল পূর্বেও বিভিন্ন হাঙ্গামার সময় লক্ষ্য করেছি, কাল্পনিক আশংকার ভিত্তিতে মানুষ ইসলামের সূরত ও বাহ্যরূপ পর্যন্ত বদলে ফেলেছে। মুসলমানরা মাথায় শিখদের মতো বেণী বেঁধেছে। অনৈসলামিক অনেক ইউনিফরম গ্রহণ করেছে। কারণ, এই অসহায়দের কাছে শুধু ইসলামের রূপটাই ছিল, হাকীকতবিহীন রূপ এই ময়দানে অবতীর্ণ হতে পারেনি।

আপনি একথাও হয় তো শুনেছেন– বিখ্যাত সাহাবী হযরত সুহাইব রূমী (র) যখন হিজরত করে যাচ্ছিলেন তখন মক্কার কাফেরগোষ্ঠী তাকে পথে আটকে ধরল। তারা বলল, সুহাইব! তুমি যেতে পার। তবে এই সম্পদ নিতে দেব না। কারণ, এই সম্পদ তুমি আমাদের শহরে বসেই তৈরি করেছ। এবার হাকীকতের সাথে লড়াই বাধল হাকীকতের। একদিকে সম্পদের হাকীকত, অন্যদিকে ইসলামের হাকীকত। যুদ্ধে ইসলামের হাকীকত জয়লাভ করল সম্পদের হাকীকতের ওপর। যদি ইসলামের হাকীকত না হয়ে সূরত হতো, ছবি হতো– তাহলে ছবি সম্পদের হাকীকতকে জয় করতে পারতো না। কারণ, ছবি কখনোই হাকীকতকে পরাজিত করতে পারে না।

হযরত আবু সালামা (রা.)-এর ঘটনাও তো শুনেছেন। তিনি যখন হিজরত করছেন তখন মক্কার কাফেররা তাঁর পথ আগলে ধরল। বলল, তুমি যেতে পার। তবে আমাদের মেয়ে উম্মে সালামাকে নিয়ে যেতে পারবে না। এখানেও সংঘাত সেই হাকীকতের। একদিকে ইসলামের হাকীকত, অন্যদিকে স্ত্রীর ভালবাসার হাকীকত। কিন্তু প্রকৃত মুমিনের অন্তরে ইসলামের হাকীকত অন্য সকল হাকীকতের চেয়ে শক্ত ও প্রবল হয়। সবচেয়ে গভীর ও প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই তিনি স্ত্রীকে আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়ে একাকী মদীনায় চলে এলেন। বলুন, ইসলামের ছবি ও সূরতের মধ্যে স্ত্রীকে ছেড়ে দেয়ার মত শক্তি ও ক্ষমতা আছে? বরং আমরা তো দেখেছি এর বিপরীত। দেখেছি মানুষ স্ত্রী-পুত্রদের জন্য ইসলাম পর্যন্ত ছেড়ে দেয়। ইসলামের সূরত ও বাহ্যপরিচয়ের তারা বিন্দুমাত্র পরোয়া করো না।

হযরত আবু তালহা (রা.)-এর ঘটনাই শুনুন। তিনি তাঁর বাগানে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন। ঠিক তখন তাঁর বাগানে ক্ষুদ্র একটি চড়ুই ঢুকে পড়ল। এবং সেটা বেরিয়ে যাবার কোন পথ ছিল না। ঝাপটা-ঝাপটি করছিল। হযরত আবু তালহার ধ্যান ভেঙে গেল। নামায শেষ করে তিনি সম্পূর্ণ বাগানটাই আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলেন। কারণ, হাকীকতে নামায এই সামান্য অংশীদারিত্বকেও মেনে নিতে পারে না। কেননা, বাগানের তো একটা হাকীকত আছে। বাগানের শ্যামলিমা রূপ, ফসলি দৃশ্য, তার মোটা অংকের মূল্য– এসবই

তো হাকীকত। সেসবের মোকাবেলা শুধু বাহ্যিক নামায করতে পারে না। এর মোকাবিলা করতে পারে নামাযের হাকীকত। আজ আপনার আমার নামায সামান্য কোন হাকীকতকেও মোকাবিলা করতে পারে না। কারণ আমাদের নামাযে হাকীকত নেই। আছে কেবল নামাযের বাহ্যিক চিত্রটা।

ইয়ারমুকের যুদ্ধের ঘটনাও আপনাদের অজানা নয়। এ যুদ্ধে মুসলমান সৈনিকের সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েক হাজার। বিপক্ষে রোমকসৈন্য ছিল কয়েক লাখ। এই যুদ্ধে এক খৃস্টান (যে কিনা মুসলমানদের পতাকা তুলে লড়াই করছিল)-এর মুখ থেকে অলক্ষ্যে বেরিয়ে এলো– রোমক সৈন্যদের সংখ্যার কি কোন হিসেব-নিকেশ আছে? সঙ্গে সঙ্গে হযরত খালিদ (রা.) বললেন ঃ খামোশ! যদি আমার ঘোড়া আশকার-এর 'সুম' ঠিক থাকতো তাহলে আমিই রোমকদের কাছে পয়গাম পাঠাতাম, যত সৈন্য আছে তার সমপরিমাণ আরও সৈন্য নিয়ে এসো। আমরা প্রস্তুত।

আচ্ছা, বলুন তো! হযরত খালিদ (রা.)-এর মধ্যে এই বিশ্বাস ও দৃঢ়তা কোত্থেকে এলো? তিনি কেন রোমকদের এই বিশাল সৈন্য সংখ্যাকে কোন পাত্তাই দিচ্ছেন না? কারণ একটাই। তাঁর এবং তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে ইসলামের হাকীকত ছিল এবং তাঁরা এও জানতেন, তাঁদের বিরুদ্ধে রোমকদের যে বিশাল সংখ্যা এগুলো শুধুই সূরত ছবি ও আকৃতি। এগুলোর মধ্যে কোন হাকীকত নেই। তাই এই লক্ষ সংখ্যার আকৃতি ইসলামের হাকীকতের সামনে দাঁড়াতে পারবে না।

আমরাও অবশ্যই কালিমা পড়ি। আমরা সকলেই কালিমার অর্থও জানি। কিন্তু এটা কালিমার হাকীকত নয়। হাকীকত অন্য কিছু। সেই হাকীকত এই শব্দ ও শব্দের অর্থেরও অনেক উর্ধ্বে। সাহাবায়ে কেরামের (রা.) মধ্যে কালিমার হাকীকত ছিল। তাঁরা যখন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলতেন তখন তাঁরা বাস্তবেও একথা মনে করতেন– আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। প্রেম ও ভয়, প্রীতি ও কীর্তির উৎস তো তিনিই। আল্লাহ ছাড়া আর কারও ওপর আশা-ভরসা করা যায় না। আল্লাহ ছাড়া আর কোন অস্তিত্বই প্রকৃত অস্তিত্ব নয়। বলুন, আমাদের অন্তরে কি কালিমার এই হাকীকত আছে? আমাদের মগজ ও চিন্তায় কি এই আস্থা ও বিশ্বাস আছে? আমাদের এই জীবন ও কণ্ঠে কি এসব চিন্তা ও আবেদন কোন শিকড় গড়তে পেরেছে? যদি আমাদের মধ্যে এসব হাকীকত থাকতো তাহলে আমরা এই কালিমা উচ্চারণ করার সময় উপলব্ধি করতাম– কত বড় কথা, কত

কঠিন কথা আমরা উচ্চারণ করছি! এই হাকীকত সম্পর্কে যার বিন্দুমাত্র ধারণা আছে সে যখন নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করবে তখন সে সত্যিই উপলব্ধি করবে কত বড় দাবি সে করছে।

"যখন বলি, আমি মুসলমান!
যখন ভাবি 'লা-ইলাহা'র সংকটগুলো-
তখন কেঁপে ওঠি অজান্তেই ॥ "

আমরা জানি আখিরাত সত্য। বেহেশত-দোযখ এক অকাট্য বাস্তবতা। মৃত্যুর পর নির্ঘাত আবার উঠতে হবে জীবন্ত হয়ে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের এই জানার মধ্যে যে হাকীকত ছিল তা কি আমাদের মধ্যে আছে? এই হাকীকতের ফসল এই ছিল- এক সাহাবী খেজুর খেতে খেতে এই বলে খেজুরের পুটলী ছুঁড়ে মারছেন- খেজুর শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে পারব না। এটা অনেক দীর্ঘ সময়। অতঃপর ছুটে যান ময়দানে এবং শাহাদাতের সুধা পানে ধন্য করেন জীবন।

এর কারণ হলো বেহেশ্ত তাঁদের কাছে একটা হাকীকত ছিল। সেই হাকীকত প্রতিষ্ঠিত ছিল তাঁদের অন্তরে। আর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলেই তাঁরা কসম করে বলতে পারতেন-আমি উহুদ পাহাড়ের ওই দিক থেকে বেহেশতের সুগন্ধি পাচ্ছি।

ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময় এক সাহাবী হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর খেদমতে এসে বলেন ঃ আমীর! আমি সফরের জন্য প্রস্তুত। কোন সংবাদ আছে? আবু উবায়দা (রা.) বললেন, "হ্যাঁ? অবশ্যই সংবাদ আছে। আমীরুল মু'মিনীনকে আমার সালাম বলবে এবং বলবে, আপনি আমাদেরকে যেসব ওয়াদা করেছিলেন তার সবটিই পূর্ণ হচ্ছে।'

এই হলো একীন ও বিশ্বাসের হাকীকত। বলুন, এই হাকীকতকে পরাজিত করতে পারে এমন কোন শক্তি এই পৃথিবীতে আছে? অধিকন্তু এই বিশ্বাসে বলীয়ান যে জামাত যে গোষ্ঠী তাদেরকে পরাজিত করতে পারে এমন শক্তিই বা কোথায়?

ইসলামের হেফাযতের জন্যে সূরত-ই যথেষ্ট নয়

ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় যে বিপ্লব হয়েছে তা হলো, এই উম্মতের একটি বড় অংশ বরং সম্ভবত সবচেয়ে বড় অংশে হাকীকতের স্থান দখল করে

নিয়েছে সূরত। এটা এখনকার কথা নয়। শত শত বছরকার পুরানো কথা এটা। শত শত বছর ধরে সূরত হাকীকতের স্থান দখল করে আছে। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দর্শকরা সূরতকে হাকীকত মনে করে ধোকা খেয়েছে এবং সূরতকে হাকীকত মনে করে দূরে সরে রয়েছে। ভয় করেছে। নিরাপদ স্থানে অবস্থান করেছে। কিন্তু কেউ একজন এসে যখন সাহস করে সেই সূরতকে স্পর্শ করেছে তখন টের পেয়েছে ভেতরে ফাঁকা। উপরে হাকীকতের আবরণ মাত্র। মূলত হাকীকত নেই। হাকীকত এখন গায়েব।

আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, কৃষকরা অনেক সময় জমিতে পাখি তাড়াবার জন্য কাকতাড়ুয়া বসায়। এক খণ্ড কাঠ বা বাঁশের গায়ে জামা পড়িয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় ফসলি জমির মাঝখানে। একে দেখে পাখি ও অন্য প্রাণীরা মনে করে কোন মানুষ হয়তো এখানে দাঁড়িয়ে রাখালী করছে। কিন্তু যদি কোন শেয়ানা কাক বা অন্য কোন প্রাণী বা গোঁয়ার কোন জানোয়ার সাহস করে সেই জমিতে চলে যায় তাহলে বলার অপেক্ষা রাখে না কাকাতাড়ুয়া তাকে কিছুই করতে পারবে না। অতঃপর স্বাভাবিকভাবে সকল পশু-পাখি ঝাঁপিয়ে পড়বে সেই ক্ষেত্রে এবং অবশেষে তাকে ধ্বংস করেই ছাড়বে।

ইতিহাস বলে, মুসলমানদের সাথে ঠিক এই ধরনের আচরণ-ই চলছে। তাদের সূরত যখন হাকীকতে রূপান্তরিত হয়েছিল তখন তাদের রক্ষা ও নিরাপত্তা নিয়ে কোন ভাবনা ছিল না। তাদের হাকীকতই তাদেরকে হেফাযত করেছে। পৃথিবীর সকল জাতিই তাদেরকে ভয় করেছে। কেউ তাদের কাছে আসার হিম্মত করেনি। ইসলাম ও ইসলামের হাকীকত ও তার ঘটনাবলী সবই ছিল তাদের স্মৃতিপটে জীবন্ত বাস্তবতা। কেউ মুসলমানদের ওপর হামলা করতে সাহস পেত না। অবশেষে যখন হাকীকতের স্থান দখল করে নিল সূরত ও নিষ্প্রাণ ছবি, তখনও তাদের প্রতি ভয় রইল সকলের। কিন্তু সেটা আর কত দিন। তাতারীরা যখন বাগদাদে হামলা করে বসল, বছর বছর ভয় ও শংকার পর অবশেষে যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেই পড়ল তখন নেকাব খুলে গেল সূরতের। মুসলমানদের মান-সম্মান ধুলায় লুটালো। কাকতাড়ুয়ার স্বরূপ যখন উন্মোচিত হয়ে যায় তখন কি আর তার কোন মূল্য থাকে? আজ মুসলমানদের অবস্থাও তাই। ইসলামের সূরত চিত্ররূপ আজ তাদের রক্ষা করতে অক্ষম। তারা এখন চারদিক থেকেই হামলার শিকার। এখন মুসলমানদের রক্ষার জন্য প্রয়োজন ইসলামের হাকীকত, ঈমানের হাকীকত।

আজ পৃথিবী জুড়ে মুসলমানদের পতন ও পরাজয়ের সয়লাব চলছে। ইতিহাসের পাতায় যে জমা পড়ে আছে পরাজয় ও পতনের অসংখ্য কাহিনী- এগুলো মূলত সূরতের পতন, হাকীকতের পতন নয়। হাকীকতের পতন হয় না।

সূরত আমাদের বারবার অপমানিত করেছে। পরাজয়ের বিষ সংবাদ শুনিয়েছে বারবার। এতে ভুল ছিল আমাদের। আমরা অসহায় সূরতের ওপর হাকীকতের দায়িত্বটা চাপাতে চেয়েছি। অসহায় কাকতাড়ুয়ার ওপর কি কোন সবল মানুষের বোঝা চাপানো যায়! অবশেষে বেচারা সূরত তো পতিত হয়েছেই। সঙ্গে আমাদের সম্মান, গৌরব ও ঐতিহ্যের অট্টালিকাসহই পতিত হয়েছে।

দীর্ঘদিন হলো ময়দানে ইসলামের হাকীকত অনুপস্থিত

দীর্ঘকাল ধরে ইসলামের সূরত ও চিত্র পরীক্ষার মুখোমুখি। যুদ্ধের ময়দানে মার খাচ্ছে প্রতিদিন। বারবার পরাজিত হচ্ছে, আর ইসলামের হাকীকত অনর্থক বদনাম হচ্ছে। পৃথিবীর দৃষ্টিতে অপমানিত হচ্ছে ইসলামের হাকীকত। পৃথিবীর তাবৎ বেঈমানরা ভাবছে, আমরা ইসলামকে পরাজিত করছি। তারা তো জানে না, দীর্ঘ দিন হলো প্রকৃত ইসলাম নেই। ইসলামের চিত্রটা এখন ময়দানে। কাকতাড়ুয়ার সাথে তারা লড়াই করছে আর ভাবছে বীরযোদ্ধা কোন আদম সন্তানকেই বুঝি পরাজিত করে দিয়েছে। আজ যে বিশ্বজুড়ে লড়াই হচ্ছে সেটা প্রকৃত মুসলমানের সাথে নয়। লড়াই হচ্ছে মুসলমানদের সূরত ও চিত্রের সাথে।

ইউরোপীয় জাতি-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তুর্কীরা ময়দানে নেমেছে, কিন্তু ইসলামের একটি ঢিলা রূপ নিয়ে। শরীর তার নেহাত দুর্বল। দুর্বল ও ঢিলা এই জাতি বেশিক্ষণ মোকাবিলা করতে পারেনি। ফিলিস্তীনে সমগ্র আরব কওম ও রাষ্ট্রশক্তিসমূহ মিলে লড়াইয়ে নেমেছে ইহুদীদের বিরুদ্ধে। কিন্তু তাদের মধ্যে না আছে ইসলামের হাকীকত, না আছে শাহাদাতের অসীম প্রেরণা; না আছে জিহাদী জোশ, না আছে ঈমানী বল। তারা বরং আরব জাতীয়তাবাদের নেশায় বিভোর। নাম আছে সাথে ইসলামের। ইসলাম বলতে শুধু এইটুকুই। কিন্তু এই নিষ্প্রাণ চিত্র হাকীকতহীন সূরত ইহুদীদের জঙ্গীশক্তি, কৌশল ও অস্ত্রের নিপূণ এস্তেমালের মোকাবিলায় বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারেনি। কারণ, সূরত কখনোই হাকীকতের মোকাবিলা করতে পারে না। চিত্র কী করে জীবন্তজনের বিরুদ্ধে লড়াই করবে? ইহুদীদের মধ্যে তো হাকীকত আছে, হোক সে হাকীকত

বস্তুতান্ত্রিক। আর আরবদের মধ্যে আছে শুধু সূরত। যদিও তা পবিত্র, তবুও তো সূরত। সূরত তো সূরতই। সূরত তো আর হাকীকত হতে পারে না।

বিজয়ের অঙ্গীকার ছিল হাকীকতের সাথে

ইসলামের সূরতেরও আল্লাহ তাআলার দরবারে একটা মূল্য আছে। তাই দীর্ঘ দিন ধরে ইসলাম বেঁচে আছে ওই চিত্রের মধ্যে। এটা ইসলামী হাকীকতের কভার। বাহ্যরূপ ওটা। এই রূপও আল্লাহর দরবারে প্রিয়। কারণ, এটা আল্লাহর প্রিয়জনদের রূপ ও আকার। ইসলামের রূপটাও তাই আল্লাহর অনেক বড় নেয়ামত। কেননা এই রূপ থেকে হাকীকত পর্যন্ত যাওয়া খুব সহজ। যেখানে সূরতটাও নেই সেখানে তো হাকীকত পর্যন্ত যাওয়া অনেকটা অসম্ভব। খুবই মুশকিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আল্লাহর রহমত, সাহায্য ও বিজয়ের অঙ্গীকার হাকীকতের সাথে। এই পার্থিব জগতের জয়, পরকালের মুক্তি, উন্নত মর্যাদা লাভ সবই এই হাকীকতের সাথে সম্পৃক্ত। এসবের কোন সম্পর্কই সূরতের সাথে নেই। হাদীস শরীফে আছে—

اِنَّ اللّٰهَ لَايَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ (الحديث)

'আল্লাহ তাআলা তোমাদের বাহ্যরূপ ও সম্পদের দিকে তাকান না।
তিনি দেখেন তোমাদের আমল ও আত্মাকে।'

যেসব লোকের মধ্যে শুধু সূরত আছে, হাকীকত নেই তাদেরকে তুলনা করা হয়েছে এমন কাষ্ঠখণ্ডের সাথে যেগুলো অন্য কিছুর ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَاِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ـ (منافقون ٤)

'যদি তুমি তাদের প্রতি তাকাও তাহলে তোমার কাছে তাদের শরীর ও আকৃতি খুবই ভাল মনে হবে। যদি তারা কথা বলে তাহলে তুমি কান পেতে শুনবেও। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, ওগুলো অন্যের ওপর দাঁড়ানো কাষ্ঠখণ্ডমাত্র। তারা প্রতিটি ধ্বনিই নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে।' [মুনাফিকুন : ৪]

ধর্মীয় বিজয় ও নিরাপত্তার অঙ্গীকার

তাছাড়া এই পার্থিব জগতের বিজয় আল্লাহর সাহায্য ও নুসরতের অঙ্গীকারও এই হাকীকতের ওপরই নির্ভরশীল। আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ইরশাদ করেছেন—

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

তোমরা ভেঙে পড়ো না, চিন্তিত হয়ো না! তোমরাই বিজয়ী হবে।

যদি তোমরা মু'মিন হতে পার। '[আলে-ইমরান ঃ ১৩৯]

'যদি তোমরা মুমিন হতে পার' এর অর্থ হলো, যদি তোমরা হাকীকতে ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পার। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, এই আয়াতে সম্বোধনই করা হয়েছে মুসলমানদেরকে। তারপরও শর্ত আরোপ করা হয়েছে, বিজয়ী তোমরা হতে পারবে, যদি মু'মিন হতে পার, সত্যিকারের ঈমানদার হতে পার।

অন্য আয়াতেও ঈমানের সাথেই আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ـ

'আমি নিশ্চয় আমার রাসূলগণকে সাহায্য করব এবং সাহায্য করব তাদেরকে যারা ঈমানদার এই পার্থিব জগতে এবং পরকালেও। যেদিন আল্লাহ তাআলার সাক্ষীগণ দাঁড়াবেন।' *[মু'মিন ঃ ৫১]*

এই ঈমানী হাকীকতের ভিত্তিতেই আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীর রাজত্ব, খেলাফত, জীবনের নিরাপত্তা, শান্তি ও ধর্মীয় বিজয়ের অঙ্গীকার করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে—

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ـ

'যারা ঈমানদার এবং নেককর্মপরায়ণ তাদের সাথে আল্লাহ তাআলা অঙ্গীকার করেছেন–তিনি তাঁদেরকে এই পৃথিবীতে খেলাফতী-শাসন ব্যবস্থা দান

করবেন, যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খেলাফতী শাসনক্ষমতা দান করেছিলেন। এবং আল্লাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত তাদের দ্বীন-ধর্মকেও প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং তাদের ভয়কে নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করবেন।' [আন-নূর ঃ ৫৫]

এই সকল অনুগ্রহ ও দান সবকিছুই নির্ভরশীল ঈমান ও নেক আমলের ওপর। তারপরও শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তাদেরকে ইসলামের হাকীকতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। প্রতিষ্ঠিত হতে হবে পরিপূর্ণ তাওহীদের ওপর। ইরশাদ হচ্ছে—يَعْبُدُوْنَنِىْ وَلَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا

(এই শর্তে) তারা আমারই ইবাদত করবে; আমার সাথে আর কাউকে শরীক করবে না।' [আন-নূর ঃ ৫৫]

উম্মতের সবচেয়ে বড় খেদমত

এই সময় উম্মতের সবচেয়ে বড় কাজ ও সবচেয়ে বড় খেদমত হলো, উম্মতের অধিকাংশ সদস্যকে সূরত থেকে হাকীকতের দিকে টেনে আনা। চিত্র থেকে প্রকৃত দ্বীনের দিকে ডেকে আনা। ইসলামের ছবি ও চিত্রের মধ্যে ইসলামের রূহ ও হাকীকত সৃষ্টি করতে চেষ্টা করা। এটাই এখন সবচে' বড় কাজ। এরই ভিত্তিতে অবস্থার পরিবর্তন হবে, ফলাফল নির্ধারিত হবে। বিশ্বময় মুসলিম মিল্লাতের যে নাযুক পরিস্থিতি তা এই সূত্রেই গ্রন্থিত।

হযরত ঈসা (আ)-এর ভাষায় ঃ এই মুসলিম উম্মাহ হলো এই মর্তজগতের জন্য লবণস্বরূপ। খাবারের স্বাদ নির্ভর করে লবণের ওপর। আর লবণের স্বাদ নির্ভর করে লবণাক্ততার ওপর। তাই যদি লবণ লবণাক্তই না হয় তাহলে তার কি মূল্য আছে বলুন। তারপর খাবারকে সুস্বাদু বানাবার আর কী উপায় থাকে? বর্তমান পৃথিবীর সমগ্র জীবনই যেন ছন্দহীন। প্রাণ নেই কোথাও। নির্মলতা নেই। কারণ, উম্মতের অধিকাংশজনই হাকীকতশূন্য। আত্মাহীন, প্রাণহীন। তারপর জীবন ও কর্মে প্রাণ আসবে কোত্থেকে? হাকীকত আসবে কোত্থেকে?

শিকড় শুকিয়ে গেছে তাদেরও

পৃথিবীর অন্যান্য সম্প্রদায়ের অবস্থাও তথৈবচ। হাজার হাজার বছর ধরে তারা তাদের মাযহাব ও ধর্মের হাকীকত থেকে ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অবশিষ্ট আছে কিছু প্রাণহীন রুসূম ও রেওয়াজ। সামাজিক কিছু অনুষ্ঠান ছাড়া আর ধর্ম বলতে

কিছুই নেই তাদের মধ্যে। তাদের ধর্মীয় ও আত্মিক জীবনের অবসান হয়েছে আরও পূর্বেই। তাদের জীবনের শিকড়ে পানি নেই। আজ পৃথিবীর কোন শক্তি ও ব্যক্তি কিংবা কোন ইসলাহ ও সংশোধনী বিপ্লবই তাদের মধ্যে প্রকৃত রূহ ও প্রাণ সৃষ্টি করতে অক্ষম। তাদের মধ্যে নতুন করে প্রাণের সৃষ্টি করার চেয়ে বরং নতুন কোন সম্প্রদায়ের সৃজন ও নির্মাণ অনেকটা সহজ। আর যারা এই মৃত সম্প্রদায়ের মধ্যে নবজীবন সৃষ্টির জন্য সাধনা করেছেন তারা বর্তমানকালের অসংখ্য উপায়-উপকরণ সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ, তাদের মধ্যে ঈমান, একীন, বিশ্বাস ও দ্বীনী রূহ নেই। দ্বীনী রূহ ও আত্মিক প্রাণের উৎস অনেক পূর্বেই শুকিয়ে গেছে। জীবনের গ্রন্থি বহু পূর্বেই কেটে গেছে। কোন বৃক্ষের শিকড় কেটে গেলে কি আর পানি ঢেলে তার পত্র-পল্লব সতেজ করে রাখা যায়?

ফিরে যেতে হবে হাকীকতের দিকে

তবে এই উম্মতে মুসলিমার জীবনের উৎস শুকায়নি। তাদের জীবন ও বিশ্বাসের শেকড় কেটে যায়নি; বরং এখনো তারা শেকড়ের সাথেই গ্রন্থিত। আর সেই উৎস হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান। আখেরাত ও হিসাব-কিতাবের প্রতি বিশ্বাস। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। আজকের এই পতিত যুগেও আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের সাথে এই উম্মতের যে সম্পর্ক তা অন্য যেকোন সম্প্রদায়ের বিশিষ্টজনদের ভাগ্যে জুটেনি। এই পতনের যুগেও তাদের মধ্যে ঈমান ও ইসলামের যতটুকু হাকীকত পাওয়া যায় তা অন্য কোন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পরিপূর্ণভাবেই অনুপস্থিত।

মুসলমানদের আসমানী কিতাব (কুরআনে কারীম) এখনো সংরক্ষিত। তাদের হাতেই আছে সে কিতাব। তাদের পয়গাম্বরের পবিত্র জীবন আজও হাজারো-লাখো মানুষের হৃদয়ে অগ্নি সৃষ্টি করতে সক্ষম। সময়ের বিরুদ্ধে বিপ্লবী করে তুলতে সক্ষম। পবিত্র সীরাত আজও সুরক্ষিতভাবে উম্মতের হাতে আছে। তাদের চোখের সামনে আছে সাহাবায়ে কেরামের জীবন। তাঁদের জীবন বিপ্লব, তাদের বিপ্লবী জীবন ছোঁয়ায় রূপান্তরিত বিশ্ব-ইতিহাস মুছে যায়নি মুসলমানদের হৃদয় থেকে। এগুলোই তাদের জীবন-উৎস। তাদের জীবনের উষ্ণতা ও আলোকময়তার কেন্দ্রও এগুলোই।

এখন শুধু সূরতকে হাকীকতে রূপান্তরিত করা। এই প্রয়োজনটুকুর উপলব্ধিকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করে তোলা। উৎস ও কেন্দ্রের সুতোয় নতুন

করে জীবনকে বেঁধে নেয়া। সম্পর্কের উন্নতি সাধন। বস্তু ও জীবিকার বাঁধন থেকে আলাদা হয়ে এসব কেন্দ্র ও উৎস থেকে ফয়েয, বরকত ও আলো অর্জন করার মত ফুরসত সৃষ্টি করা এখন অনিবার্য। প্রয়োজন, প্রকৃত জীবনের সন্ধানে এই থেমে পড়া স্রোতহীন জীবনে নতুন ইনকিলাব সৃষ্টি করা। জীবনব্যাপী ঈমান, ইহতিসাব, আল্লাহর ওয়াদার প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর প্রতি আগ্রহ আকর্ষণে রূহ ও প্রাণ সৃষ্টি করা।

আমাদের মূল দাওয়াত শুধু এইটুকু— يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা বাহ্যিক ঈমান থেকে প্রকৃত ঈমানে উন্নীত হও।' [নিসাঃ ১৩৬]

এখন শহরে শহরে মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে ঘুরে আমরা এই দাওয়াত দিচ্ছি, প্রতিটি অঞ্চলে এমন একটি মারকায ও কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার যেখানে মুসলমানগণ একত্রিত হয়ে তাদের বিস্মৃত অতীতকে স্মরণ করবে। যেখানে তারা তাদের হারানো ঐতিহ্যের সন্ধান পাবে। সন্ধান পাবে ঈমান ও ইসলামের হাকীকতের। হারানো জীবনের ঠিকানা পাবে যেখানে এসে। যেখানে নবীজীর জীবন ও ইসলামী জীবন-বিশ্বাসের ঘটনাবলী ও ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের কথা হবে। মুসলমানদের আবেগ ও অনুভূতি জাগ্রত হবে। জোশ ও জযবা পুনরুজ্জীবিত হবে। তাদের মধ্যে ইসলামী বিপ্লবের তামান্না সৃষ্টি হবে। যদি এই ধরনের মারকায সৃষ্টি না হয়, তাহলে বিশাল আকারের ইসলামের হাকীকত ও রূহ সৃষ্টির কী আশা করা যায়?

সেই সাথে আমরা মুসলমানদের এই আহ্বান জানাই, ইসলামের হাকীকত হাসিল করার জন্য কিছুদিন কিছু সময় অবসর করে এমন পরিবেশে আসুন যেখানে হাকীকতের চর্চা ও অনুশীলন হয়। এমন পরিবেশে গিয়ে কিছু সময় ব্যয় করুন, যেখানে প্রকৃত জীবনের কিছু ঝলক নজরে পড়ে। যেখানে ইলম, যিক্‌র, দাওয়াত ও তাবলীগ, খেদমত, কুরবানী, বিনয়, চরিত্র, পরিশ্রম, সাধনা ও কৃচ্ছ্রতা আছে। এই লক্ষ্যে আমরা মুসলমান ভাইদের দলবদ্ধভাবে বের হওয়ার দাওয়াত দিচ্ছি।

যদি মুসলমানদের মধ্যে একটি বিশাল অংশ এ পথে বেরিয়ে আসেন এবং মুসলিম সমাজে যদি এর যথাযথ প্রচলন ঘটে তাহলে আমরা আশাবাদী, কোটি কোটি মানুষের হৃদয় পর্যন্ত হয়তো আল্লাহ তাআলা ইসলামের হাকীকতের

দাওয়াত পৌঁছে দেবেন। লক্ষ লক্ষ মুসলমানের জীবনে হয়তো রূহে ঈমান, ইসলামের হাকীকত ও গুণাবলী জীবন্ত হয়ে উঠবে।

হাকীকত সৃষ্টি হতে পারে

আমরা নিরাশ নই যে, ইসলামের যে হাকীকতের ওপর এক সময় মুসলিম মিল্লাত প্রতিষ্ঠিত ছিল তা আর পুনর্বার সৃষ্টি হবে না। আমরা মনে করি না, হাকীকতপূর্ণ কোন যুগ ও ইনকিলাব আর হবে না। আপনি একটু পেছনের দিকে ফিরে দেখুন। ইতিহাসের মহাসমুদ্রে ইসলামী হাকীকতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক দ্বীপই নজরে পড়বে আপনার। দেখবেন, যেসব দ্বীপাঞ্চলে বারবার ইসলামের হাকীকত তরঙ্গময় হয়ে উঠেছে এবং ঈমানী উষ্ণতায় দীপ্ত হয়ে উঠেছে। সেই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, নবীজির প্রতি একীন ও আস্থা, শাহাদাতের জযবা, বেহেশতের প্রতি উথলে ওঠা আকর্ষণ, পার্থিব জীবনের ওপর পরকালকে প্রাধান্য দেয়ার বজ্রকঠিন মনোভাব যেখানেই যিন্দা হয়ে উঠেছে, যেখানেই ইসলামের রূহ ও হাকীকত জেগে উঠেছে সেখানেই বিরুদ্ধ শক্তি ও অবস্থার ওপর তার জয় হয়েছে। নতুন করে জীবন্ত হয়ে উঠেছে অতীতকালের বিজয় ও জেগে ওঠার ঘটনাবলী।

সেই হাকীকত আজো বীর্যময়

ঈমান ও ইসলামের হাকীকত আজো বীর্যময়, শক্তিময় যেমনটি ছিল ইসলামের শুভ প্রভাতকালে। অতীতকালে যেসব ঘটনার প্রকাশ ঘটেছে আজো তেমনি ঘটনার সৃষ্টি করা সম্ভব, যদি হাকীকত সৃষ্টি হয়। এখনো দরিয়া পার হওয়া, সমুদ্রে ঘোড়া চালানো সবই সম্ভব। আজও জঙ্গল ছেড়ে হিংস্র বন্যরা ছুটে পালাবে, আগুন হবে ফুলের বাগান। তবে শর্ত একটাই ঈমানী হাকীকত, ইবরাহীমী হাকীকত সৃষ্টি করতে হবে প্রথমে।

آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا
اگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا

আজও যদি গড়তে পার
ইবরাহীমের বজ্র ঈমান;
অগ্নি চিরে পয়দা হবে
শান্তিদায়ক ফুল বাগান।

চাই খোদার গোলামী

বন্ধুরা আছে, হৃদয়ের ব্যথা সব খুলে দাও!
জলসা পুনর্বার হবে তা কে জানে ....

বন্ধুগণ!

আজ আমি আপনাদের সাথে কিছু মনের কথা বলব। কিছু হৃদয়ের কথা বলব। বলব এমনভাবে যেন আমি আপনাদের প্রত্যেকের সাথে আলাদা আলাদাভাবে বসে কথা বলছি। আর যদি বাস্তবেও এটা সম্ভব হতো, তাহলে সত্যিই আমি আপনাদের প্রতিটি বন্ধুর সাথে আলাদাভাবে বসেই মনের এই কথাগুলো বলতাম। বলতাম এই কারণে, যাতে আপনারা আমার কথাগুলোকে বক্তৃতা মনে না করে এক বন্ধুর মনের কথা, বেদনার কথা এবং দরদভরা আন্তরিক আবেদন মনে করেন। কিন্তু কী করব! এটা তো আর সম্ভব নয়। সম্ভব হলে তো নির্বাচনের প্রার্থীরা অবশ্যই এটা করত। ইলেকশনে জয় লাভের জন্যে তারা সভা-সমিতি করতো না। কারণ এসব সমাবেশে তাদেরকে এমনসব কথা জনসমক্ষে বলতে হয় যা একান্তে নির্জনে বলাটাও অসুন্দর। নিজের প্রশংসা করতে হয়, নিজের মুখে নিজের যোগ্যতার দাবি করতে হয়, নিজের প্রশংসা নিজেকেই কাব্যিক করে শোনাতে হয়। তাই আপনাদের সমীপে এই আবেদনটুকু করব, আমার এই কথাগুলোকে স্টেজের বক্তৃতা মনে না করে হৃদয়ের আহ্বান মনে করবেন। মনে করবেন, এগুলো একান্তই আমার মনের কথা যা আপনাদেরকে বন্ধু হিসেবে বলতে চাই।

দুই ধরনের জীবন

সম্মানিত বন্ধুরা!

নানা রঙের জীবনধারা বয়ে চলছে এই পৃথিবীতে। জীবনের ধরন ও মডেলের কোন অন্ত নেই। পাশ্চাত্যের জীবন, প্রাচ্যের জীবন। আধুনিক জীবন, প্রগতিশীল জীবন। সেকেলে জীবন, রক্ষণশীল জীবন। আরও কত রঙের জীবন! কিন্তু প্রকৃত অর্থের জীবন দুই ধরনের। যথা—

এক. নফসপূজারী জীবন।

দুই. খোদাপূজারী জীবন।

এর বাইরে জীবনধারার বিচিত্র আরও যত নাম শোনা যায় তার সবগুলোই এই দুই প্রকারেরই শাখা-প্রশাখামাত্র।

নফস্পূজারী জীবন হলো, কোন ব্যক্তি নিজেকে লাগামহীন এক উটের মতে চালিত করল। মন যা চাইল তাই করল। মন ও রিপুর অনুগত এই জীবনকেই নফসপূজারী জীবন বলে। দ্বিতীয় প্রকার জীবন হলো, এক ব্যক্তি বিশ্বাস করে, নিশ্চয় তার একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। সৃষ্টিকর্তাই তার জীবনের মালিক, তার প্রকৃত শাসক। তার প্রয়োজন ও সমস্যাবলীর কথা তিনিই সর্বাধিক জ্ঞাত এবং তাঁর পক্ষ থেকে জীবনযাপনের কিছু নীতিমালা দেয়া আছে যেগুলো মেনে চলা অনিবার্য ও অত্যাবশ্যকীয়।

আমাদের ভারতবর্ষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নামে একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এর ঐতিহাসিক গুরুত্বকে আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে আরেকটি ঐতিহাসিক কুরুক্ষেত্রের সন্ধানও আমরা পাই। সেটা অবশ্য এই কুরুক্ষেত্রের চেয়েও প্রাচীন। সেটা ছিল 'নফ্সপূজারী আর আল্লাহপূজারীর' লড়াই এবং এই লড়াই চলছে অনবরত। এর কোন শেষ নেই। এই লড়াই বিশেষ কোন রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধও থাকেনি বরং এই লড়াই পৃথিবীর প্রতিটি রাজ্যে পা দিয়েছে। যুদ্ধের ময়দানকে অতিক্রম করে ঘর-দোর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

এ ছিল জীবন চলার দুটি পথ বরং দু'টি আদর্শ এবং সর্বদাই এর একটি অপরটিকে পরাজিত করতে চেয়েছে। সম্মানিত নবী-রাসূলগণ সর্বদাই নিজ নিজ যুগের নিজ নিজ অঞ্চলের লোকদের এই আল্লাহ পূজারী' জীবনের পথে দাওয়াত দিয়েছেন। রিপু ও প্রবৃত্তির দাসত্বকে পরাজিত করে এক আল্লাহর দাসত্বের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁরা যেখানে বিজয়ী হয়েছেন সেখানে এই আল্লাহপূজারী জীবন বিশ্বাসেরই বর্ণাঢ্য চর্চা ও অনুশীলন হয়েছে। তাই বলে নফসপূজার চেতনা কখনোই চিরতরে নিঃশেষ হয়নি; বরং যখনই সুযোগ পেয়েছে নড়ে উঠেছে। জীবন-বিশ্বাস গ্রাস করে নিয়েছে। পরাজিত করেছে শাশ্বত জীবনবোধ।

দুর্ভাগ্য যে, আমরা এখন যে সময়টাতে বসবাস করছি এ সময়টা কিন্তু পরিপূর্ণভাবেই নফস্পূজারীর দখলে, রিপু ও কামতাড়নার অনুগত। মন ও নফসের জয় জয়কার এখন সর্বত্র। জীবনের সকল ক্ষেত্র, সকল অঙ্গন এখন নফস ও রিপুর কব্জায়। ঘর-দোর, বাজার-মার্কেট, অফিস-আদালত, শিল্প-কারখানা সর্বত্রই মন ও রিপুর বসন্তকাল চলছে। যেন একটি যৌবনপূর্ণ সমুদ্র সমগ্র স্থল জগৎজুড়ে বয়ে চলছে রাগিণী- তেজস্বিনীরূপে। আমরা সকলে গলাগলি করে ঝাঁপিয়ে পড়ছি সেই বহমান সমুদ্রে।

এই রিপুপূজা এখন একটি স্বতন্ত্র দর্শন; বরং সর্বকালেই এটা একটা মাযহাব ও ধর্ম-বিশ্বাসের মতোই বয়ে চলেছে এবং সর্বকালেই এর অনুসারীর সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। যদিও ধর্ম ও দর্শনের ফিরিস্তি খুঁজলে কোথাও এর নাম পাওয়া যাবে না এবং এই নামের অধীনে কোন ধর্ম-দর্শনে বিশ্বাসীদের জরিপও কখনো করা হয় না। অথচ এ এক অকাট্য সত্য। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ধর্ম-দর্শন হলো এটা। এর অনুসারীর সংখ্যাই সর্বাধিক।

আমরা যেসব ধর্ম ও মাযহাবের শুমারী শুনি– যেমন খৃস্টান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা এত, হিন্দু ধর্মের অনুসারী এত, ইসলাম ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা এত। অথচ খোঁজ নিলে দেখা যাবে এসব ধর্মের অনুসারী বলে কথিতজনদেরই একটি বিরাট অংশ নামে খৃস্টান, হিন্দু কিংবা মুসলমান হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা 'নফ্সপূজারী' ধর্মের অনুসারী।

নফস পূজার ক্ষতিসমূহ

নফসপূজারী জীবনের প্রচলন ও তার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার মূল কারণ হলো, এতে মানুষ খুব মজা পায়। এর ছত্রে ছত্রে তারা ভিন্ন স্বাদ ও তৃপ্তি অনুভব করে। যেহেতু প্রত্যেক মানুষই স্বভাবগতভাবে স্বাদ ও তৃপ্তির প্রতি আগ্রহ বোধ করে থাকে তাই এর পেছনে বড় প্রতিযোগিতা। কিন্তু যদি পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চিন্তা করা হয় তাহলে এটাই প্রমাণিত হবে, এটা পৃথিবীর জন্যে একটি জঘন্য লা'নত, ভয়ঙ্কর একটি অভিশাপ। প্রমাণিত হবে, পৃথিবীর সকল দুঃখ, সকল কষ্টের মূল হলো এই নফ্স পূজা। আর পৃথিবীময় সমুদয় ধ্বংস, দুর্ভিক্ষ, জুলুম, অত্যাচার ও ত্রাসের হোতাও তারাই যারা এই নফ্সপূজার শিকার।

এই পৃথিবীতে নফ্স পূজার সুযোগ কেবল তখনই দেয়া যায়, যদি সমগ্র পৃথিবীতে কেবল একটিমাত্র মানুষের অস্তিত্ব ও বসবাস হয় এবং সেখানে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব না থাকে। তখনই কেবল সে তার মনমত যাচ্ছেতাই জীবন যাপন করতে পারবে। অথচ বাস্তবতা তো এমনটি নয়। বরং বাস্তব সত্য হলো, এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এখানে কোটি কোটি মানবসন্তান সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে এই পৃথিবীতে আবাস দিয়েছেন। তাদের প্রত্যেককেই নফস, মন ও রিপু দিয়েছেন। দিয়েছেন নফস ও রিপুর চাহিদা, প্রেরণা ও আকাঙ্ক্ষা। তাছাড়া নফস ও রিপুর চাহিদা ও প্রয়োজন তো একটার পর একটা লেগেই থাকে।

এমতাবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি তার মনমত জীবনযাপন করতে চায় তাহলে এর অর্থ হলো, সে তার মত মন ও চাহিদার অধিকারী আরও যে মানুষ তার পাশেই উপস্থিত– বসবাস করছে সে একথা স্বীকার করছে না। কিন্তু সে অস্বীকার করলেই তো আর বাস্তবতা হারিয়ে যাবে না বরং বাস্তব তার জায়গায় বহাল থাকবেই। তবে এই কিছুসংখ্যক মানুষের নফসপূজারী স্বভাব ও আচরণ অন্যদের জন্য কিছু সমস্যার সৃষ্টি করবে অনিবার্যভাবে।

নফসপূজারী ব্যক্তিরা মনের রাজা হয়ে থাকে। আর যারা মনের রাজা হয় দুনিয়াব্যাপী তাদের চাহিদার, ইচ্ছার ও আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ হলেও তাদের পেট ভরে না। ভরতে পারেও না। তার ইচ্ছা ও চাহিদা তখন আরও প্রাপ্তির নেশায় মোহাচ্ছন্ন থাকে। এবার চিন্তা করুন, যদি একজন 'মনের রাজা'র চাহিদা পূরণের জন্য এক পৃথিবী যথেষ্ট না হয় তাহলে যখন পৃথিবীর প্রতিটি ঘরে কয়েকজন রাজার নিবাস তখন দশাটা কি রকম দাঁড়াবে? তাদের পেট কিভাবে ভরবে? চাহিদা ও স্বপ্ন কী করে পূরণ হবে?

এই মনপূজা প্রতিটি ঘরে চার চারজন মনের রাজা তৈরি করে দিয়েছে। বাপ রাজা, মা রাণী। এখন এই ঘরে শান্তি ও সুখ থাকবে কী করে। এই নফসপূজার সমুদ্রে ডুবে সকলেই স্বাদ ও তৃপ্তি পেতে চায়; বরং এ এক অগ্নিকুণ্ড। এই আগুনে জ্বলছে ঘরের প্রতিটি সদস্য, জ্বলছে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক, জ্বলে ভস্ম হচ্ছে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ।

দুনিয়ার বিপদের উৎস

মূলত পৃথিবী জুড়ে এখন যে বিপদের সয়লাব চলছে, চলছে দুর্দশার অমাবস্যা-এর মূল কারণ হলো, সকলেই চাচ্ছে তার মন ও নফস যা চাচ্ছে সে তাই করবে। এই বিপদ ও দুর্দশার চিকিৎসা একটাই, মনের আনুগত্য ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর আনুগত্য কর। কারণ, এই ক্ষুদ্র পৃথিবী কোটি মানুষের তো দূরের কথা দুই ব্যক্তির মন মত জীবন-যাপনের সুযোগও এখানে নেই। তাই প্রথমেই মনমত জীবনযাপনের দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করতে হবে এবং এমনভাবে জীবন যাপনের চেষ্টা করতে হবে, যেভাবে জীবনযাপনের আহ্বান জানিয়েছেন আল্লাহ প্রেরিত পয়গাম্বরগণ। আল্লাহপূজারী সেই জীবনের পয়গাম নিয়েই যুগে যুগে– সবযুগে নবী-রাসূলগণ আগমন করেছিলেন। কারণ, এই জগতের সুশৃঙ্খল জীবন ব্যবস্থা এই পদ্ধতির অনুসরণ ছাড়া আদৌ সম্ভব নয়।

নবী-রাসূলগণ তাঁদের সবটুকু সামর্থ্যের বিনিময়ে এই আহ্বান মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিয়েছেন। নফসপূজার ভ্রান্ত শক্তিকে পরাস্ত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলেছি, তারপরও এই ভ্রান্ত শক্তি পরিপূর্ণভাবে নিঃশেষ হয়ে যায়নি কখনো; বরং যখনই আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দান দুর্বল হয়ে পড়েছে, সত্যের পয়গাম থেমে গেছে, তখনই নফসপূজারী শক্তি মাথা নাড়া দিয়ে উঠেছে। তার উত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই এই অবাঞ্ছিত শক্তির স্রোতে মানুষের সুখ-শান্তি বিদায় নিয়েছে। সমাজ-সংসার ছেয়ে গেছে বিপদের ঘনঘটায়। অসহ্য যন্ত্রণা-দুর্দশায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সমাজ ও সভ্যতা।

উপমাস্বরূপ খৃষ্টাব্দ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করুন!

এই শতাব্দীতে এসে নফস পূজার প্রচলন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যায়। শেষ যাত্রা স্পর্শ করে মন ও রিপু চর্চার মুক্ত অভিলাষ। দেশে দেশে ছিল এর বন্যা। যেন প্রবৃত্তি চর্চার এক তরঙ্গায়িত দরিয়া। ছোট-বড় সকলেই সেই দরিয়ার ঢেউয়ের তালে দোল খাচ্ছে। রাজা-প্রজা সকলেই ছিল এই ব্যাধির শিকার। উপমাস্বরূপ ইরানের অবস্থাই শুনুন।

ইরানের রাজা-প্রজা সকলেই ছিল ব্যাধিগ্রস্ত। রাজার অসুস্থতার দশা ছিল এই–এক রাজার স্ত্রী সংখ্যা ছিল বার হাজার। মুসলমানগণ যখন এই সম্প্রদায়কে ভয়ঙ্কর এই ব্যাধি থেকে মুক্ত করার জন্য হামলা করলেন তখন ইরানের বাদশাহ সিংহাসন ছেড়ে পালিয়ে যান। এই পলায়নপর দুরবস্থার মধ্যেও তার সঙ্গে বাবুর্চির সংখ্যা ছিল এক হাজার। তারপরও তার আক্ষেপের সীমা ছিল না। আহা! কী রিক্ত হস্তে পালিয়ে এলাম। সেকালের একজন জেনারেল এবং সিপাহ্সালার একলক্ষ ইরানী মুদ্রা দামের টুপি ও ক্যাপ ব্যবহার করতো। উন্নত সোসাইটির লোকদের জন্য কমদামি বস্ত্র ব্যবহার পাপ ও কঠিন অপরাধ বিবেচনা করা হতো। এই কথিত উচ্চ শ্রেণীর লোকদের এই রিপুর দাসত্ব আর নফসপূজা সাধারণ লোকদের কোথায় নিয়ে দাঁড় করিয়েছিল সে অবস্থা অনুমান করার জন্য এতটুকু জানাই যথেষ্ট– তারা তাদের জমি চাষ করার ক্ষমতাও ছিল না। জায়গা-জমি ছেড়ে তারা ইবাদতখানা আর খানকায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।

যারা ছিল মধ্যবিত্ত তারা আমীর-উমারাদের প্রতিযোগিতায় দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল। ফলে সমাজ জীবন এলোমেলো হয়ে পড়েছিল। কোথাও স্থিতি নেই, বন্ধন নেই, আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্য নেই। সারকথা হলো, জীবন বলতে কিছুই

ছিল না। যা ছিল সে এক প্রতিযোগিতার মাঠ। জুলুম-অত্যাচার ছিল বাতাস আর পানির মত ব্যাপক। যে কোন বড় তার ছোটকে, রাজা তার প্রজাকে নির্যাতন করতে, লুট করতে, তার রক্ত চুষে নিতে সদা সচেষ্ট ছিল। সমগ্র সমাজ ছিল রক্তাক্ত-আহত। বলুন, এমন পরিবেশে কি বিশ্বাস, চরিত্র আর আদর্শের লালন হয়? এই অবস্থায় পরকালের স্মরণ আর চিন্তাকে কে ধরে রাখতে পারবে? বরং এসব দামি সওদা তো তখন রিপুপূজার তোড়ে অবলীলায় ভেসে বেড়াচ্ছিল। সে সয়লাবকে ঠেকাবার মত কেউ তখন ছিল না। এই স্রোতকে বাধা দেয়ার মত কেউ উঠে দাঁড়ায়নি।

বুদ্ধিজীবি, আলিম-উলামা, সাহিত্যিক-দার্শনিক সকলেই সেই বন্যার পানিতে ছিন্নমূল তৃণ-লতার মত ভাসছিল। স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত বুকের পাটা কারোরই ছিল না। আর স্রোতও তো পানির স্রোত নয় যে, দেয়াল তুলে দিয়ে পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা করা যাবে। সে তো বরং সভ্যতা ও চরিত্রের সয়লাব।

এক সিংহদিল মানুষ

সন্দেহ নেই, স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত ক্ষমতা যে কেউ করতে পারে না। পারে কেবল তাঁরাই যাঁরা সিংহদিল। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল, তিনি এই স্রোতের মোড় ঘুরাবেন। তাই তিনি এই কাজের জন্য আরবে একজন মানুষ সৃষ্টি করলেন। তাঁকে নবুওয়াত দান করলেন। হ্যাঁ, যাকে আমরা 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' নামে স্মরণ করি। [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।] তিনি যে শুধু এই স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন তাই নয় বরং এই স্রোতের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া তখন এমন কোন লোকের দ্বারাও কর্মসিদ্ধ হবার ছিল না, যে এই স্রোতের মোড় না ঘুরিয়ে ভাসমান লোকগুলোকে তুলে নিয়ে আসবে। কারণ তখন তো কোথাও এমন কোন স্থান ছিল না যেখানে এনে কোন শুদ্ধ কিছু রাখা যায়। সয়লাব ছিল সর্বত্রব্যাপী। ইবাদতখানা, গীর্জাঘর তো এই স্রোতে রীতিমত উর্মিমাতাল। সেখানে ঢেউ উঠা-নামা করছিল তখন। সেই সমুদ্রে কোন আশ্রয় কেন্দ্র ছিল না। যদি থাকেও কিছু তা একান্তই আশংকাজনক অবস্থায় বরং বিপদ সংকেততাড়িত এক ভীতিপ্রদ দশায় সদা নীলমুখো। ঈমান, আখলাক, ভদ্রতা, সভ্যতা– ছোট কথায় মানবতার রূহ্ ও আত্মাকে এই ভয়ঙ্কর প্রলয়-সয়লাব থেকে বাঁচাবার মত কঠিনতম কর্ম কেবল এমন ব্যক্তির পক্ষেই সম্পাদন করা সম্ভব ছিল– যাঁর মধ্যে ধারা পরিবর্তন করার মত হিম্মত ও সাহস হবে। যে কঠিন

প্রত্যয়ের সাথে এই সর্বনাশা সয়লাবের প্রতিরোধে দৃঢ়সংকল্প হয়ে দাঁড়াতে পারবে। সত্যি করে বলতে গেলে, এই মহান গুণের অধিকারী সত্তা এই কঠিনক্ষণে এই ভয়াল দুর্দিনে একমাত্র সর্বশেষ পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মদ (স) ছাড়া আর কেউ ছিল না।

তিনি পরিপূর্ণ আস্থা, হিম্মত ও দৃঢ়তার সাথে দাঁড়ালেন এবং অল্প কয়েক বছরের অবিরাম চেষ্টা ও সাধনার বদৌলতে নফস ও রিপুমুখী তুফানকে আল্লাহমুখী করে দিয়েছেন। রিপুপূজার অন্ধত্ব রূপান্তরিত হয়েছে আল্লাহর দাসত্বে- আলোকিত আবদিয়্যাতে। খৃস্টাব্দ ষষ্ঠ শতাব্দীর পৃথিবীর দিকে তাকালে এক বিস্ময়কর ইনকিলাব-অবিশ্বাস্য বিপ্লব নজরে পড়ে। এই বিপ্লব সমগ্র জীবন এবং অবশেষে সমগ্র পৃথিবীকে ঝাঁকুনি দিয়েছে। প্রভাবিত করেছে, করেছে আলোকিত। এখনো যে পৃথিবীতে মানবতা, ঈমান, বিশ্বাস ও ইলাহী দাসত্বের ছিটে-ফোঁটা নজরে পড়ে এটাও প্রকৃত পক্ষে সেই সাধনারই ফসল।

এখন যে দুনিয়াময় বসন্তের ভরা যৌবন
এসবই তাঁর হাতে বোনা ফসল।

আপনাদের কেউ হয়তো সংশয় পোষণ করতে পারেন, সেকালের সকলেই নফ্সপূজারী ছিল এটা বলা কি ঠিক হলো? কারণ, সেকালে তো কত রঙের পূজারীই ছিল! সূর্যপূজারী ছিল, অগ্নিপূজক ছিল, ক্রুসেডপূজারী ছিল, বৃক্ষপূজারী ছিল, পাথরপূজারী ছিল। আর কত কি! বলি, একথা যথার্থ। এতে আমাদেরও দ্বিমত নেই। তবে এসব পূজা সেই নফসপূজারই বিভিন্ন প্রকারমাত্র। আমার দাবি হলো, সর্বত্র কার্যত প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ছিল ওই মনপূজা, নফসপূজা। রিপুর দাসত্ব। এতসব বস্তুর পূজা এ কারণেই করা হতো যেহেতু এগুলো নফসের বিরোধী নয়। এসব পূজা তাদের মনমাফিক স্বেচ্ছাচারী জীবন পথে বাদ সাধতো না, কাম ও রিপুর স্বপ্নপথে প্রতিবাদ করতো না।

তারা ওই জড় বস্তুগুলোকে এই জন্য পূজা করতো, যেহেতু এই পথের বৃক্ষ চন্দ্র সূর্য আর প্রস্তরখণ্ড তাদেরকে বলতো না– এই কাজটা কর কিংবা ওই কাজটা করো না। তাই ওসব বস্তু পূজার সঙ্গে সঙ্গে নফস ও রিপু পূজাটাও হয়ে যেত। দুয়ের মধ্যে তো আর কোন সংঘাত ছিল না।

সারকথা হলো, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (স) এই স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। সংগ্রাম করেছেন। লড়াই করেছেন। সমগ্র সমাজের বিরুদ্ধে বিপ্লব করেছেন।

তিনি ছিলেন এই সমাজেরই। ছিলেন সকলের দৃষ্টিতেই বিশ্বস্ত সত্যবাদী– আস-সাদিকুল আমীন। তিনি এই সামজের সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। সকলের চোখেই ছিলেন সম্মানিত। সমাজে তাঁর গুরুত্ব ও অবস্থান এতটা দৃঢ় ও প্রতিষ্ঠিত ছিল– তিনি চাইলেই সমাজ জীবনের যে কোন উন্নতি কিংবা সর্বোচ্চ বড় পদ দখল করে নিতে পারতেন। হ্যাঁ, এটা তখনই সম্ভব ছিল, যদি তিনি তাঁর সমকালীন সমাজ ও চিন্তাকে ভুলপথে চালিত ভ্রান্ত মনে না করতেন। প্রচলিত বিশ্বাস ও সভ্যতার বিরুদ্ধে যদি সংগ্রাম না করতেন।

কিন্তু তিনি কি তা করবেন? তাঁর প্রভু তো তাঁকে এই জন্যই পাঠিয়েছেন– এই ঘোলাপানির স্রোতে ভেসে যাবেন না। কাউকে শুকনো তৃণের মত ভাসতেও দেবেন না। এই জন্যে সর্বপ্রথম তিনি যে কাজটি করেছেন তাহলো, প্রথমে তিনি নিজেকে কাঙ্ক্ষিত সেই ইলাহী দাসত্বের– আল্লাহপূজারী জীবনের আদর্শ নমুনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বরং সেই স্রোতের বিরুদ্ধে নিজেকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। অবতীর্ণ হয়েছেন আল্লাহমুখী সমাজ নির্মাণের বিপ্লবে। তাঁর এই বিপ্লবকে ফলপ্রসূ ও সার্থক করার জন্য মানবজাতির সামনে তিনটি মৌলিক বিষয় তুলে ধরেছেন। যথা–

১. তোমরা সকলেই বিশ্বাস কর, তোমাদের এবং এই বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা ও শাসনকর্তা একজন।

২. বিশ্বাস কর, এই জীবনের পর দ্বিতীয় আরেকটি জীবন আছে। সে জীবনে এই জীবনের হিসাব কিতাব দিতে হবে।

৩. এবং বিশ্বাস কর, আমি আল্লাহর পাঠানো দূত। তিনি আমাকে জীবন যাপনের রীতিনীতি ও আইন-কানুন দিয়ে পাঠিয়েছেন। সেইসব বিধি-বিধান আমাকেও মেনে চলতে হবে এবং তোমাকেও।

তিনি যখন এই ঘোষণা সকলকে শোনালেন তখন তাঁর সমাজে একটা নাড়া পড়ে গেল। আলোচনা-সমালোচনার ঝড় উঠল। বিরোধিতার সূচনা হলো। কারণ, এই স্লোগান তাদের আত্মপূজারী রিপুভক্ত জীবনের আরাম ও শান্তির মূলে আঘাত করেছিল। সারা পৃথিবী যে পথে চলছে সে পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথে চলে আসা কি চাট্টিখানি কথা! জীবনতরী প্রচলিত সভ্যতার সয়লাবে অনায়াসে ভেসে চলছিল। চলছিল স্রোতের বহতা গতির সাথে। তাদের এমন কি ঠেকা পড়েছে, স্রোতের বিপরীতে উজানে তরী চালাবার! সহজ ও সারল্যকে ছেড়ে কঠিন ও কষ্টের পথে চলার কী দরকার পড়েছে? যে পথের বাঁকে বাঁকে কষ্ট, ভয়, শংকা-সমূহ বিপদের আশংকা সে পথে কে কিশতী চালায়? তাই তারা চেষ্টা

করল, এই শ্লোগানটি স্তিমিত করে দিতে। কণ্ঠ চেপে ধরতে চাইল তারা। আবার কেউ কেউ তো হযরত (স)-এর নিয়ত ও ইচ্ছা সম্পর্কেও সংশয় করে বসল। কারণ, তাদের বুঝে আসছিল না কী করে তাদেরই মতো একজন মানুষ এই ভয়ঙ্কর স্রোতকে উল্টো দিকে চালিত করবার কথা বলে। যে স্রোতে শুধু সাধারণরাই নয় বরং সমকালীন সকল উলামা, মনীষী, বিজ্ঞানী, ধর্মগুরু, সাধক-সন্ন্যাসী, সাহিত্য-সভ্যতায় নেতৃপুরুষ এবং তাদের আখলাক-চরিত্র, বিশ্বাস, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি সবই শুকনো খড়-কুটার মত ভাসছে– সেখানে তাদেরই মত একজন মানুষ বলছে, এই স্রোতকে পাল্টে দিতে হবে। এই সভ্যতাকে নতুন করে সাজাতে হবে। এটা কি করে সম্ভব? তাই তাঁরা হযরত (স)কে এ বিষয়ে মুখলিস ও নিঃস্বার্থ বলে মেনে নিতে পারেনি। এ ছিল তাদের অক্ষমতা।

সকল প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম

তারা যেহেতু হযরত (স)-এর স্বপ্নও লক্ষ্য এবং তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তি ও হিম্মত সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল, বরং সেটা উপলব্ধি করার ক্ষমতাই তাদের ছিল না- তাই তারা ভাবল, নিশ্চয় এর মধ্যে রহস্য আছে, কোন মতলব আছে। এই সুউচ্চ আওয়াজ ও আহ্বানের পশ্চাতে নিশ্চয় ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য কার্যকর। তাই তারা হযরত (স)-এর খেদমতে একটি প্রতিনিধি দল পাঠাল। তারা তাদের ধারণামতে হযরতের সমীপে তিনটি বড় বিষয় পেশ করল।

তারা বলল ঃ আপনি যা বলছেন তার অর্থ যদি হয় আপনি আমাদের নেতা হতে চান তাহলে এসব কথা বলা ছেড়ে দিন। আমরা আপনাকে নেতা মেনে নিচ্ছি। আর যদি আপনার লক্ষ্য হয়, প্রচুর অর্থ-বিত্ত, তাতেও আমরা রাজি আছি। আর যদি কোন সুন্দরী নারীর প্রতি আপনার আকর্ষণ থাকে তাও বলুন। আমরা তাতেও একমত। আমরা আরবের সবচে' সুন্দর নারীটি আপনার খেদমতে তুলে দেব। তবুও আপনি যে নতুন কথার সুর তুলেছেন এটা ক্ষান্ত দিন। বন্ধ করুন!

এই প্রস্তাবের জবাবে আল্লাহর সত্য নবী ও ইলাহী দাসত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পতাকাবাহী অত্যন্ত সরল ও অকুণ্ঠ ভাষায় বললেন, আমি তোমাদের কাছে কিছুই চাই না। আমি বরং তোমাদের কিছু দিতে চাই, যাতে তোমরা পরকালীন জীবনে সুখ পেতে পার। আর সেই সুখ নির্ভর করে আমার পূর্বোক্ত তিনটি কথা মেনে নেয়ার ওপর। কথাটি যে শুধু মুখেই বলেছেন তাই নয়, হযরতের সারাটা জীবন

দিয়ে এ কথাই প্রমাণিত করে গেছেন, আমি কিছুই নিতে চাই না। আমি দিতে চাই। পার্থিব কোন কিছুর প্রতি আমার আকর্ষণ নেই।

অবশেষে তাদের শত্রুতা ও বিরোধিতা প্রচণ্ড মূর্তি ধারণ করল। রাসূল (সা) মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে যেতে বাধ্য হলেন। কিন্তু আল্লাহর দাসত্ব ও খোদাপূজার দাবি থেকে এক চুল সরে দাঁড়াননি। বিরুদ্ধবাদীরা জানতো না, তিনি নফস্‌পূজা ও মনপূজা থেকে কতদূরে অবস্থান করেন। তারা অনুমান করতে পারেনি, নফস ও রিপুর এই বেগবান সয়লাবের উজান পথে সাঁতার কাটার মত কত শক্তি তাঁর বাহুতে আছে। তাঁর হিম্মত, সাহস ও সংকল্প কত দৃঢ়, কত অবিচল তা তারা মাপতে পারেনি।

নফস রিপু ও মনের তাড়না থেকে তিনি এতটা পবিত্র ছিলেন যে, মক্কা থেকে বিতাড়িত হবার পর যখন কয়েক বছর পর বিজয়ীর বেশে পুনরায় মক্কায় ফিরে এসেছেন, তখন তাঁর শত্রুরা পরাজিত, নতমস্তক। কিন্তু তখনও তাঁর সেই আল্লাহপূজারী মন ও চিন্তায় এক বিন্দু পরিবর্তন আসেনি। বিজয়ের কোন মাদকতা তাঁকে মুহূর্তের জন্যেও স্পর্শ করতে পারেনি। বিজয়ীর বেশে যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তিনি উটের ওপর সওয়ার। গায়ে খুবই সাধারণ মানের পোশাক। মুখে আল্লাহর প্রতি শুকরিয়ার বাণী। হৃদয়-মন চিন্তা-অনুভব শান্ত-নমিত। এই সময় এক ব্যক্তি হুযূরের সামনে এসে ভয়ে কাঁপতে লাগল। তখন হযরত (স) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ভয় পেও না। আমি এক গরীব কুরাইশী নারীর সন্তান, যে নারী শুকনো গোশত আহার করতো।

একবার ভাবুন তো! কোন বিজয়ী এমন সময় এমন পরিবেশে এমন কথা বলতে পারে? এমন কথা বলতে পারে, যার কারণে মানুষের মন থেকে তাঁর ভয় চলে যায়? বরং এসব ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের অন্তরে আরও ভয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়। বর্তমান পৃথিবীর দিকে তাকান কিংবা ইতিহাসের পাতায় অতীত দিনের কাহিনী পড়ুন। যাদের হাতে যখনই শাসনক্ষমতা এসেছে তাদের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজনরা পর্যন্ত কতটা লাভবান হয়েছে তার দ্বারা। সুখ বিলাস আর ভোগের ক্ষেত্রে তারা কতটা পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছে তা ইতিহাস গ্রন্থে এখনো সংরক্ষিত। কিন্তু আল্লাহর দাসত্বের পতাকাবাহী এই মহান পয়গাম্বরের জীবন এ ক্ষেত্রেও ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।

তাঁর কন্যা ঘরের সব কাজ নিজ হাতে করতেন। যে কারণে তাঁর হাতে কর পড়ে হাত শক্ত হয়ে গিয়েছিল। শরীরে পানির মশক টানার দাগ পড়ে গিয়েছিল।

একদিন তিনি শুনতে পেলেন, যুদ্ধের ময়দান থেকে কিছু গোলাম আর দাসী আব্বাজানের কাছে এসেছে। ভাবলেন, আমিও দুই একজন গোলাম কিংবা দাসী চেয়ে নেব। গেলেন। নিজের কষ্টের কথা বললেন। হাত বের করে দেখালেন। তখন আব্বাজান (স) বললেন ঃ মা! আমি তোমাকে এই দাস-দাসীর চেয়েও ভাল জিনিস দেব। এগুলো মুসলমানদের নিতে দাও। শোন ঃ তুমি রাতে শোয়ার সময় ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে।' এই হলো আল্লাহপূজারী দুনিয়াবিমুখ মন ও হৃদয়ের চিত্র।

এতে সন্দেহ নেই, তিনি ছিলেন আবদিয়্যাত ও দাসত্বের ময়দানের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তারপরও কি তাঁর প্রতি নফস ও রিপুর কলংক আরোপ করা যায়? অন্যদের প্রতি উদার হস্তে সম্পদ বিলান আর নিজের সন্তানদেরকে দারিদ্র্য, অভাব ও নিঃস্বতার মধ্যে ধরে রাখা এটা কেবল পয়গাম্বরের পক্ষেই সম্ভব! এটা তাঁদেরই মানায়।

দাসত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পতাকাবাহীর অবদান

আমাদের চারপাশে এমন অনেক লোক আছে, যারা বিগত দিনগুলোতে কয়েক বছর জেল খেটে এসেছে। তারপর যখন তারা ক্ষমতায় এসেছে তখন বিগত দিনের কষ্টের ফসল সুদে-আসলে ঘরে তুলতে ব্যস্ত তারা। আমরা দেখি, যে কেউ ক্ষমতার কুরসীতে বসার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের ছেলে সন্তান এবং আত্মীয়-স্বজনকে আইনের পাকড়াও থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু আল্লাহর দাসত্বে মশগুল এই সত্য পয়গাম্বর (স) এ ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চরিত্রের অধিকারী।

এক মহিলা চুরি করেছে। প্রমাণিতও হয়েছে। রাসূল (স) হাত কেটে দেয়ার আদেশ দিলেন। সকলে মিলে রাসূলুল্লাহ'র অত্যন্ত প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ সাহাবী যায়েদকে দিয়ে সুপারিশ করালেন। মাফ করাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সুপারিশ করতেই হযরত (স)-এর চেহারা রাগে লাল হয়ে উঠল এবং বললেন, আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মদের প্রিয়তমা কন্যা ফাতিমাও এই অপরাধ করতো তাহলে মুহাম্মদ তারও হাত কেটে দিত।

হযরত রাসূলে কারীম (স) তাঁর সর্বশেষ পালিত হজ্জে মুসলমানদের এক বিশাল সমাবেশে কিছু নীতিমালা ঘোষণা করেন। তিনি কিছু আইন-কানুন ঘোষণা করেন। সেসব আইন সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেন নিজের এবং নিজের আত্মীয়-স্বজনের ওপর। তিনি ঘোষণা দেন, জাহেলী যুগের সকল নিয়মনীতি

আজ থেকে রহিত ঘোষণা করছি এবং সেইসব রহিত ও মূর্খ প্রথার মধ্য থেকে সুদি লেন-দেন এখন থেকেই শেষ। সর্বপ্রথম আমি আমার চাচা আব্বাসের (র) সুদি কর্জ বাতিল ঘোষণা করছি। এখন থেকে তার কোন সুদি পাওনা আর কাউকে পরিশোধ করতে হবে না। একেই বলে আল্লাহপূজা, খোদার দাসত্ব।

অথচ বর্তমান যুগের আইন প্রণেতারা যদি এই ধরনের আইন তৈরি করেনও তাহলে প্রথমেই নিজের আত্মীয় এবং বন্ধুজনদের বলে দেবে– এই ধরনের আইন আসছে। সুতরাং নিজ নিজ পাওনা আগেই আদায় করে নাও। বিলম্ব না করে নিজের ঘর গুছিয়ে নাও। জমিদারি বন্ধ হয়ে যাবে। তাই নিজের নামে যতটুকু পার আলাদা করে নাও। বিক্রি করতে পারলে বিক্রি করে নাও।

হযরত (স) এই মহাসম্মেলনে আরও ঘোষণা দিয়েছেন, ইসলামপূর্ব যুগের সকল রক্ত বাতিল করা হলো। এখন সেসব খুনের আর কোন বদলা নেয়া যাবে না। আর সেসব খুনের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি (আমার বংশের) রাবিআ ইবনুল হারিসের খুন বাতিল ঘোষণা করছি।

সারকথা, এভাবেই নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সাথে তিনি আল্লাহর দাসত্বের পথে, নফসের দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়তে থাকেন অবিরাম যার দু'একটি উপমা আমরা এখানে পত্রস্থ করলাম মাত্র।

তাঁর এই লড়াই ছিল সমাজের সকলের বিরুদ্ধে, মনের বিরুদ্ধে, বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, স্বপ্ন ও কামনার বিরুদ্ধে, পৃথিবীর সকলের বিরুদ্ধে। অবশেষে তিনি সফলও হয়েছেন। মানুষ বাধ্য হয়েছে তাঁর কথা কান পেতে শোনতে। হৃদয়ের দরজা খুলে শুনতে বাধ্য হয়েছে তারা। শুনেছে এবং মেনেছেও। অনন্তর তারা যখন হযরত (স)-এর পেশকৃত তিনটি মৌলিক কথা স্বীকার করে নিয়েছে– আল্লাহ'র দাসত্বসুলভ জীবনের ভিত্তি যে তিনটি কথা– দেখা গেছে তখনই লক্ষ মানুষের জীবনের মোড় মুহূর্তে বদলে গেছে। কোটি মানুষের জীবনপথ রূপান্তরিত হয়েছে। বদলেছেও এমনভাবে যা আজকের এই যুগে বিশ্বাস করাও মুশকিল। বিস্ময়কর সেই রূপান্তরিত মানব কাফেলার মধ্য থেকে দু'একটি উপমা তুলে ধরছি এখানে।

সিদ্দীকী অবদানের ঝলক

প্রিয় নবীজীর (স) ডাকে যারা সাড়া দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ছিলেন অন্যতম। হযরত (স)-এর ওফাতের পর তিনিই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হোন। ইসলামী শাসন ব্যবস্থার প্রধান তথা খলীফা পদে আসীন হন।

কিন্তু তাঁর স্বভাব-চরিত্র, রিপু ও নফস থেকে এমনভাবে মুক্ত হয়ে উঠেছিল যে, ইসলামী শাসন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও যখন তাঁর স্ত্রী একদিন আরয করলেন, বাচ্চারা মিষ্টান্ন খেতে চাচ্ছে। তিনি উত্তরে বললেন, সরকারি কোষাগার তো আমাদের মুখ মিষ্টি করার দায়িত্ব নেয়নি। তবে আমাদের প্রতিদিনের যে খরচ কোষাগার থেকে আসে তা থেকে কিছু বাঁচিয়ে যদি পার মিষ্টান্ন রান্না করে খাওয়াও। বেগম সাহেবা তাই করলেন। দৈনন্দিন খরচ থেকে সামান্য করে বাঁচাতে লাগলেন। যখন সামান্য কিছু সঞ্চয় হলো হযরত আবু বকরের (রা) হাতে তুলে দিয়ে বললেন, কিছু বাজার এনে দিন, বাচ্চাদের জন্য মিষ্টান্ন রান্না করব। হযরত আবু বকর পয়সাগুলো নিয়ে বায়তুল মালে তথা সরকারি কোষাগারের কোষাধ্যক্ষকে দিয়ে বললেন ঃ দেখুন, এটা এই কোষাগারেরই সম্পদ। এত দিনে এই পয়সাগুলো বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। বোঝা যায় এতটুকু পয়সা কম হলেও আমাদের সংসার চলতে পারে। তাই এখন থেকে আমাদের সরকারি ভাতা এই পরিমাণ কমিয়ে দিন।

ফারুকী সমতা

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারূক (রা)। তাঁর শাসনামলে যখন মুসলমানগণ বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করলেন এবং হযরত উমর (রা) সেখানে গেলেন তখন তার সঙ্গে ছিলেন একজন গোলাম। কিন্তু ইসলামী সাম্রাজ্যের সবচে' বড় সেই ব্যক্তির কাছে তখন সওয়ারি ছিল মাত্র একটি। তাই তাতে খলীফা কিছুক্ষণ সওয়ার হতেন, কিছুক্ষণ সওয়ার করাতেন ভৃত্যকে।

যেতে যেতে যখন তাঁরা বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করছিলেন তখন সওয়ার ছিল ভৃত্য আর ওমর হাঁটছিলেন সওয়ারির রশি ধরে। তাঁর গায়ের জামাটিতে শোভা পাচ্ছিল অনেকগুলো তালি।

তাঁরই শাসনামলে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন তিনি দুর্ভিক্ষগ্রস্ত একজন সাধারণ প্রজা যে খাবার খেতে পায় তারচে' উন্নত খাবার নিজের জন্য হালাল মনে করতেন না।

হযরত খালিদ (রা)-এর ইসলাম

হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রা) ছিলেন মুসলমানদের প্রধান কমাণ্ডার। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (স) তাকে (সাইফুল্লাহ আল্লাহ'র তলোয়ার) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। কিন্তু তিনি নফস ও রিপুর বলয় থেকে এত উর্ধ্বে ছিলেন যে, একবার এক যুদ্ধ চলাকালীন সময় বিশেষ কোন কারণে হযরত উমর (রা) তাঁকে

তাঁর পদ থেকে অব্যহতি দেন। সংবাদ পেয়ে তাঁর মধ্যে কোন ভাবান্তর পর্যন্ত হয়নি; বরং বলেছেন, আমি যদি আজ পর্যন্ত উমরের সন্তুষ্টি কিংবা সুনামের জন্য লড়াই করতাম তাহলে এখনই লড়াই ছেড়ে চলে যেতাম। কিন্তু আমি এ পর্যন্ত সকল যুদ্ধেই অংশ নিয়েছি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। সুতরাং কমাণ্ডারের পরিবর্তে এখন আমি সিপাহী হিসেবেই লড়াই করে যাব।

অথচ এর বিপরীত চিত্র 'মেক আরথার' -এর ঘটনা আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই। যাকে ট্রুম্যান কোরিয়ায় যুদ্ধরত বাহিনীর সিপাহসালার করে পাঠিয়েছিল। তাকে যখন রাজা তার পদ থেকে বহিষ্কার করে তখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং রাজা ট্রুম্যানের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে।

এই শুধু এক দুইজনই নয়, হযরত (সা) পুরো সমাজটাকেই একটা আদর্শের ওপর গড়ে তুলেছিলেন। সেই আদর্শের মূল কথা ছিল, মনের দাসত্ব নয়– আল্লাহর দাসত্ব। আনুগত্য ও গোলামি হবে একমাত্র আল্লাহর। হযরত (স) এর নিয়ম ছিল, কেউ যদি পদের আকাঙ্ক্ষা করতো তিনি তাকে অবশ্যই বঞ্চিত করতেন। তাকে কখনোই পদে বসাতেন না। এই জাতীয় সমাজে পদপ্রার্থী হওয়া, নিজের প্রশংসা ও যোগ্যতার বয়ান দেয়া, ক্ষমতা লাভের জন্য প্রতিযোগিতার কোন অবকাশ ছিল না। যাদের সম্মুখে সর্বদা আল্লাহর এই বাণী ছিল—

تِلْكَ الدَّارُ الْأٰخِرَةُ ـ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ـ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ـ (قصص ٨٣)

"সেই আখিরাতের ঘর আমি তাঁদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছি, যাঁরা এই পৃথিবীতে নিজেদের বড়ত্ব চায় না এবং বিপর্যয়ও সৃষ্টি করে না। শেষ ফলতো আল্লাহভীতুদের জন্যই।" (কাসাস ঃ ৮২)

সারকথা, এই আল্লাহভীতিই পৃথিবীর সামনে পেশ করেছিলেন আমাদের নবী (স)। ফলাফলের দৃষ্টিতে এই পৃথিবীকে সর্বাধিক উপকৃত করার চেষ্টা তিনিই করেছেন। পৃথিবীর কোন সুস্থ মানুষ অন্য কোন দাওয়াতের নাম নিয়ে বলতে পারবে না, হযরত (স) এই পৃথিবীকে যতটা উপকৃত করেছেন সেও ততটা উপকৃত করেছে।

অথচ আমরা যদি তাকাই তাহলে দেখব, এই দাওয়াতের ক্ষেত্রে হযরত (স)-এর হাতে তেমন কোন উপকরণই ছিল না– আজ যেমন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজতান্ত্রিক বিভিন্ন আন্দোলনকারীদের হাতে থাকে। তারপরও

এসব দল ও সংগঠন মিলে এই পৃথিবীকে যা দিয়েছে তা হযরত (স)-এর দানের এক-দশমাংশও হবে না।

আজও যদি এই পৃথিবীকে রাজনৈতিক ত্রাস, চারিত্রিক পংকিলতা, প্রশাসনিক নির্যাতন আর সর্বপ্রকার অনিষ্টতা থেকে মুক্ত করতে হয় তাহলে এই দাওয়াতকেই গ্রহণ করতে হবে। নফস, রিপু ও মনের দাসত্বের জাল ছিন্ন করে আল্লাহ'র দাসত্বের দিকে ফিরে আসতে হবে।

কিন্তু কি বলব, যারা এই দাওয়াতের পতাকাবাহী ছিল তারাই তো এখন নফস ও রিপুর শিকার। আক্রান্ত, আহত, পরাজিত সেই রিপু ও মন এখন আল্লাহর দাসত্বের পতাকাবাহীদের থেকে প্রতিশোধ নিচ্ছে যারা তাকে পরাজিত করেছিল তারা এখন তার কাবুতে যাদের প্রশংসায় আল্লাহ তাআলা বলেছিলেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

"তোমরাই হলে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। তোমাদেরকে সৃষ্টিই করা হয়েছে মানুষের কল্যাণার্থে। তোমরা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দেবে, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে।"

আফসোস, আজ সেই মুসলমানরাই নফ্স ও রিপুর শিকার।

হে মুসলমানগণ!

তোমরা সত্যিই নিজেদের প্রতি খুব বেশি অত্যাচার-অবিচার করেছ। তোমাদের কাজ ছিল তোমরা হবে আল্লাহর গোলামির জীবন্ত নমুনা। সারা পৃথিবীর মানুষকে ডাকবে এই পথে। কিন্তু তোমরা নিজেরা রিপুর দাসত্বে পড়ে নিজেদের তো ক্ষতিগ্রস্ত করেছই- সারা পৃথিবীকেও বিপদে ফেলে দিয়েছ। তোমরা যদি তোমাদের দায়িত্বে অবিচল থাকতে তাহলে এই বিতাড়িত পরাজিত নফসপূজা পুনরায় পৃথিবীতে জেগে উঠতে পারতো না। পৃথিবীও আজকের এই করুণ দশার শিকার হতো না। বর্তমান পৃথিবীর সবচে বড় বিপদ হলো রিপুর দাসত্ব। পৃথিবীর বড় বড় লিডার এবং শান্তি ও নিরাপত্তার পতাকাবাহী (ট্রুম্যান, চার্চিল, স্টালিন আজকের বুশ, ব্রারন, পুতিন, আদভানী, অনুবাদক।) যারা তারাই পৃথিবীর সবচে বড় রিপুর দাস। তারা তাদের রিপুর তাড়না আর জাতীয় অহংকারে পৃথিবীকে ধ্বংস করতে সদা প্রস্তুত।

এটম বোমার চেয়েও অধিক ভয়ঙ্কর এই রিপুর পূজা। এই নফস ও রিপুর পূজাই পৃথিবীকে ধ্বংস করেছে এবং করছে। মানুষ অকারণেই এটমকে ঘৃণা

করে, এটমকে মন্দ বলে। আমি বলি, এটমের কী দোষ বলুন! প্রকৃত অপরাধী তো তার প্রস্তুতকারক। তারও আগের অপরাধী হলো সেইসব শিক্ষাকেন্দ্র ও সভ্যতার লালনকেন্দ্র, যারা এই এটমী সভ্যতার আয়োজক ও ব্যবস্থাপক। আর এই সবকিছুর মূলেই হলো মানুষের নফস ও রিপু। নফস ও রিপুর তাড়নাই এসব কিছুর জন্ম দিয়েছে।

আমাদের আহ্বান এক মুক্তগ্রন্থ

আমাদের দাওয়াত ও আহ্বান শুধু এইটুকুই, এসব নফস পূজার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। পৃথিবী জুড়ে আল্লাহর দাসত্বের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মূলত এই লক্ষ্যেই আমাদের এই আলোচনা। আমরা বলি, হযরত মুহাম্মদ (স) ও তাঁর সঙ্গীগণই এই আদর্শের আল্লাহপূজার প্রথম রূপকার। তাঁদের শিক্ষা, জীবন ও ঘটনাবলীই পারে আমাদেরকে চলমান অস্থিরতা থেকে মুক্তি দিতে। পারে মানবতাকে সব রকমের ঝঞ্ঝাট ও পতন থেকে রক্ষা করতে। তাই বলি, আমাদের এই আহ্বান একটি মুক্তগ্রন্থের মত। যে কেউ ইচ্ছা করলে পড়ে দে তে পারে।

আল্লাহর সাহায্য অনিবার্য, তবে

[১৯৮১ সালে কাশ্মীরের শ্রীনগরে প্রদত্ত একটি ভাষণ। 'নুসরতে ইসলাম' নামক একটি সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এই জলসায় বিপুলসংখ্যক উলামা-মাশাইখ ও ধর্মীয় চিন্তাবিদ উপস্থিত ছিলেন।]

কবি ইকবাল বলেছিলেন—
'মুসাফিরের মন ব্যথিত অনুক্ষণ
প্রবাসে যেমন নিবাসে তেমন।'

আমার অবস্থাও তাই। আসলে বড়ই দুর্ভাগা মুসাফির আমি। পৃথিবীর যে কোন দেশেই আমি গিয়েছি সেখান থেকে আমি আমার আঁজলা ভরে আনন্দের কোন সওদা তুলে আনতে পারিনি। মনে যে এক বিন্দু সান্ত্বনার সন্দেশ নিয়ে আসব সেই ভাগ্যও আমার হয়নি কখনো। এটা কি আমার তীক্ষ্ণ মেধার কারণে? নাকি এই কারণে–আমি যেখানেই যাই সেখানকার অতীত ইতিহাস আমার স্মৃতির সমগ্র আকাশ দখল করে থাকে? ইতিহাসের সমূহ ঘটনা আমার বিশ্বাসে সরবে অনুরণিত হতে থাকে এবং ইতিহাসের সেইসব ঘটনার অনিবার্য ফলাফলও ভুলে থাকতে পারি না আমি? আমি জানি না, কী কারণে এমন হয়। আচ্ছা, আমি চাইলেই কি ইতিহাসের ওই ধ্রুবসম ঘটনাবলীকে ভুলে যেতে পারি? তাছাড়া স্বয়ং কুরআনও তো এটাকে সমর্থন করে না।

وَكَاى مِنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ -

"ভু-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলে এমন অনেক নিদর্শন আছে, মানুষ যেগুলো দেখে কিন্তু তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে না বরং অবলীলায় ভুলে যায়।"

আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতাম, আজ যদি আপনাদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাতে পারতাম। হৃদয়ে শান্তি পেতাম–যদি বলতে পারতাম, সৌন্দর্যের এই দৃষ্টিনন্দন লীলাভূমিতে আপনারা ভাল আছেন। আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন, আপনাদের কোন চিন্তা নেই, শংকা নেই! কিন্তু আমি কি তা বলতে পারছি? পারছি না।

এর বড় কারণ হলো আমার কুরআনের অধ্যয়ন। কুরআনের সাথে আমার যৎসামান্য সম্পর্কের কারণেই আমার এই দশা। বিশেষ করে আমি কুরআন শরীফকে একটি জীবন্ত গ্রন্থ মনে করি। আমি মনে করি কুরআন সকলের সাথেই কথা বলে। ইচ্ছা করলে প্রতিটি মানুষই এই কিতাবে তার চেহারা দেখতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন জাতি-গোত্র, দেশ-সভ্যতার উত্থান-পতনের স্বচ্ছ দর্পণও এই কিতাব। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ الْكِتَابَ فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ -

"আমি তোমাদের প্রতি এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে
তোমাদের কথা রয়েছে–তোমরা কি চিন্তা করো না!"

পবিত্র এই গ্রন্থে আমাদের কথা আলোচিত হয়েছে। আলোচিত হয়েছে ভাল-মন্দ কাজের কথা, কাজের প্রতিদানের কথা। আল্লাহ'র বিধানাবলীর বৈশিষ্ট্যও আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে। ইরশাদ হয়েছে—

তোমাদের আশা-আকাঙ্খা কিংবা আহলে কিতাবের আশা-আকাঙ্ক্ষার ওপর নির্ভরশীল নয় আল্লাহ'র আইন। যে কেউ মন্দ কাজ করবে তাকে তার শাস্তি ভোগ করতে হবে। (নিসা ঃ ১২৩) অর্থাৎ মুসলিম সমাজ কিংবা আহলে কিতাবের লোকজন যারা নিজেদেরকে উঁচু দরের লোক মনে করে তাদের কারও মন-মানসের ওপর নির্ভরশীল নয় আল্লাহর বিধান। দুর্বলতা, অসতর্কতা, অপূর্ণতা, গাদ্দারী, বিচ্ছিন্নতা, পরস্পর লড়াই-বিবাদ, অর্থপূজা, পদপূজা– সব কিছুরই প্রতিফল আছে এখানে। এখানে বড়-ছোট, ধনী গরিবের কোন অসমতা নেই। পক্ষপাতদুষ্টতার কোন অবকাশ এই গ্রন্থে নেই। একথা পবিত্র কুরআনে

কোথাও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, আবার কোথাও বলা হয়েছে অস্পষ্টভাবে। তাই এই গ্রন্থে বড় বড় সম্প্রদায়, রাজা-বাদশাহ এবং বীর প্রতাপতেজাদের আলোচনা যেভাবে স্থান পেয়েছে, ঠিক একইভাবে স্থান পেয়েছে দুর্বল অসহায় অনাথ জনদের কথাও।

এই গ্রন্থে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বলা হয়েছে—

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بَارَكْنَا فِيْهَا ، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا وَدَمَّرْنَا مَاكَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَاكَانُوْا يَعْرِشُوْنَ [الاعراف/١٣٧]

"আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো আমি তাদেরকেই পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত (সিরিয়া) যেখানে আমি বরকত দিয়েছি, ক্ষমতা দান করেছি। বনী ইসরাইলদের ধৈর্য ধারণের ফলে তাদের সম্পর্কে তোমার প্রভুর উত্তম অঙ্গীকার পূর্ণ হয়েছে। আর ফিরাউন ও তার সম্প্রদায় কর্তৃক নির্মিত অট্টালিকা এবং বাগ-বাগিচা সবকিছুই ধ্বংস করে দিয়েছি। (আ'রাফ ঃ ১৩৭)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

وَنُرِيْدُاَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ * وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّاكَانُوْا يَحْذَرُوْنَ * [القصص/٥]

"পৃথিবীতে যারা ছিল দুর্বল আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার ইচ্ছা করলাম এবং ইচ্ছা করলাম তাদেরকেই নেতা বানাব, উত্তরাধিকারী বানাব। তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা দেব এবং ফিরাউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে এমন জিনিস প্রদর্শন করব, যাকে তারা ভয় করতো। (কাসাসঃ ৫)৬

এভাবে পবিত্র কুরআন খুলে দেখলে মনে হবে, এতে বিভিন্ন জাতির ঐতিহাসিক বর্ণনা, জীবন পরিক্রমার বিভিন্ন স্তর ও অবস্থার বিবরণ অত্যন্ত স্বচ্ছ হয়ে ফুটে উঠেছে। যে কোন ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ইচ্ছে করলেই এই কিতাব খুলে দেখতে পারে এবং নিজেদের অবস্থান খুঁজে নিতে পারে। অতি সহজেই তারা এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হতে পারে–তাদের সাথে কী আচরণ করা হবে। কারণ, আল্লাহর সাথে কারও কোন আত্মীয়তা তো নেই। তাঁর কাছে সকলেই সমান। তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন ঃ

'ইহুদী-খৃস্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর পুত্র এবং তাঁর অতি প্রিয়পাত্র। আপনি বলে দিন–(তাই যদি হয়) তাহলে তোমাদের পাপের কারণে কেন তোমাদেরকে শাস্তি দেন তিনি? বরং তোমরা অন্যান্য সৃষ্টির মতোই মানুষ।" [মাইদা ঃ ১৮]

আল্লাহপাক পবিত্র এই আয়াতে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন, ইহুদী-খৃস্টানরা যতোই বলুক, আমাদের কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমরা সকলের ঊর্ধ্বে। মানব সীমানার বহু উপরে আমাদের স্থান। কারণ, আমরা আল্লাহর সন্তান। তাঁর খুবই প্রিয়জন আমরা। আসলে তারা আর দশ জনের মতোই মানুষ। একই কাতারের মানুষ। মানুষ বলেই আল্লাহর আইন অন্যদের জন্য যেমন তাদের জন্যও তেমন। কোন রকমের ছাড় নেই, ভিন্নতা নেই।

আজ আমাকে এখানে আমন্ত্রিত করে আমার প্রতি যে আন্তরিকতা, ভালবাসা ও সম্মান দেখিয়েছেন তাতে আমি সত্যিই প্রীত। আনন্দে আমার হৃদয় মন অনুরণিত। কিন্তু এর বিনিময়ে আমিও আপনাদের প্রতি কিছু প্রশংসা বাণী ছুড়ে যাব এটাই কি যথার্থ হবে? প্রকৃত আপনজন তো তার প্রিয়জনের বিপদের কথা ভাবে। তার বিপদ হতে পারে এমন বিষয়গুলো চিহ্নিত করে। তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাকে সতর্ক করে।

হযরত 'আমর ইবনুল আস (রা)-এর কথাই বলি। তিনি যখন মিসর জয় করলেন, তখন মিসর ছিল সমকালীন সভ্যতার তীর্থভূমি। সবুজ-শ্যামলিমা আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ছিল সে সময়ের কাশ্মীর। তাছাড়া প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ, পশু সম্পদ ও মানব সম্পদে বর্ণাঢ্য এই দেশকেই হযরত আমর (রা) জয় করলেন। কিন্তু এত উন্নত সমৃদ্ধ একটি দেশ জয় করার পর একজন সাধারণ বিজেতার মনে উল্লাসের যে ঢেউ খেলার কথা তাঁর তেমন কিছুই হলো না। কারণ, তিনি প্রিয় নবীজী (সা)-এর সংস্পর্শ লাভে ধন্য ছিলেন। অধিকন্তু তিনি ছিলেন পবিত্র কুরআনের একজন বোদ্ধা চিন্তাশীল পাঠক। রাসূল ও কুরআনের স্পর্শে তাঁর হৃদয় ছিল আলোকিত। আল্লাহ পাক তাঁকে মুমিনের দূরদর্শিতা দিয়েছিলেন পূর্ণমাত্রায়। তাছাড়া সাহাবীসুলভ দূরদর্শিতা তো ছিলই। মিসর জয়ের পর তিনি আরবের সেই বিজয়ী বাহিনীকে একটি কথা বলেছিলেন, যা আজকের এই সময়ে সোনার হরফে লেখার যোগ্য। তিনি সেদিন সকলকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন– أَنْتُمْ فِى رِبَاطٍ دَائِمٍ

'তোমরা হলে সদাজাগ্রত সীমান্ত প্রহরী।'

অর্থাৎ তিনি তাঁর বাহিনীকে বলেছিলেন—এখানকার দৃষ্টিকাড়া শ্যামলিমা প্রাকৃতিক অথৈ সম্পদ আর আলোড়িত সভ্যতা-সংস্কৃতিতে যেন তোমাদের পেয়ে না বসে। পরিণামে এই দেশ, এই মাটি তোমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে পুনর্বার। তোমাদের মনে রাখতে হবে, তোমরা সর্বদাই একটি যুদ্ধ ঘাঁটিতে অবস্থান করছো। তোমরা একথা ভাববে না, কিতাবীরা হেরে গেছে। আর রোম সাম্রাজ্যের সর্বাধিক মূল্যবান এলাকাটি এখন তোমাদের পদতলে। এমন কোন ধোঁকায় যেন না পড়—আমরা তো জাযীরাতুল আরবের উপকণ্ঠে এসে পড়েছি। তোমরা যদি এমনটি ভাব আর আনন্দে খানিকটা তন্দ্রা যাও তাহলেও শত আশংকা রয়েছে। তোমরা ভুলে গেলে চলবে না, একটি সভ্যতার পতাকাবাহী তোমরা। তোমরা একটি দাওয়াত নিয়ে এসেছ এখানে। একটি সীরাত নিয়ে এসেছ তোমরা। তোমরা আরব ভূখণ্ড থেকে যে দাওয়াত নিয়ে এসেছ, দরবারে নববী থেকে যে সীরাত নিয়ে এসেছ, তোমরা যদি তোমাদের সেই পয়গামের কথা ভুলে যাও তাহলে তো তোমাদের মর্যাদার কিছু থাকলো না। তাছাড়া তোমরা তো এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভোগ করতে আসনি। অবশেষে যদি সেই ভোগ-বিলাসেই গা ভাসিয়ে দাও তাহলে তোমাদের প্রতি কেউ অনুগ্রহ করবে না। তোমরাও মুক্তি পাবে না ধ্বংসের হাত থেকে।

এখন থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে এক আরব্য সিপাহী যে কথা বলেছিলেন আজ সে কথাই সত্য ও যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। অথচ তিনি কোন ফৌজী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন না। তবুও আজ তাঁর কথাই সত্য। বর্তমান পৃথিবীর সকল মুসলিম দেশের জন্য সকল মুসলিম জাতির জন্যই অনিবার্য সত্য।

সমগ্র আরব জুড়ে যখন মুরতাদের মহামারী দেখা দিল তখনও এই দায়িত্ব সকলেরই ছিল। কিন্তু দায়িত্বানুভূতি তো আর সকলের সমান হয় না। আর এ কারণেই একজন খ্যাতি ও অমরত্বে প্রতিষ্ঠিত হন—অন্যজন পড়ে থাকে বিস্মৃতির অতল তলে। যখন ইরতিদাদ ও ধর্মত্যাগের ঝড় উঠল তখন খলীফা ছিলেন হযরত আবু বকর (রা) তিনিই তখন ধর্মত্যাগী ঝড়ের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন— أَيَنْقُصُ الدِّيْنُ وَأَنَا حَيٌّ!

'ইসলামে একবিন্দু ক্ষতি হবে—আর আমি বেঁচে থাকব?'

তিনি প্রতিবাদী হলেন। জানিয়ে দিলেন, আমি বেঁচে থাকব আর আল্লাহ'র দীনের বিধি-বিধানে নির্বাচন হবে, গ্রহণ-বর্জন হবে? বলা হবে, নামায তো ঠিক আছে, যাকাত মানি না। কিংবা যাকাত ঠিক আছে, হজ্জও ঠিক আছে তবে রোযা মানি না। এটা হতে পারে না। তাঁর কণ্ঠে এই প্রতিবাদ উচ্চারিত হবার সঙ্গে

সঙ্গেই বদলে গেল সময়ের রূপ। স্রোত মোড় নিল অন্য দিকে। একজন মাত্র মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠ স্তূপীকৃত তরঙ্গময় সকল বাধাকে অতিক্রম করে ফেলল। সেই ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। যার সারকথা হল, অবস্থা যখন ছিল ভয়াববহ তখন হযরত আবু বকর (রা)-এর একটি সিদ্ধান্তমূলক বাক্যই ছিল মূল স্পিরিট এবং তিনি তাঁর সে উচ্চারণের মর্যাদা যথার্থভাবেই রক্ষা করেছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় ইসলামের একবিন্দু ক্ষতি হতে তিনি দেননি।

আমি যে কথা বলতে চাই তাহলো, আমরা যে ভূ-খণ্ডে বসবাস করছি সেখানে ইসলাম টিকে আছে কিনা এবং তা টিকে থাকবে কিনা এটাই আমাদের বড় প্রশ্ন। আমাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য এটাই। কাল হাশরের মাঠ হবে। হযরত রাসূলে কারীম (সা) উপস্থিত থাকবেন। মহান মালিক সেদিন আদালতের বিচারক হবেন। সেদিন আমাদের জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের এই ভূখণ্ডে আল্লাহ্ তাআলা ইসলামের আলো জ্বেলেছিলেন। ওলি-আউলিয়া পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই এলাকায় এসেছেন। অতঃপর এই এলাকার লোকদের কাছে আল্লাহর বাণী ও পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন। তাদের লাগানো সেই চারাকে আমি বড় শক্তিশালী ফলবান মহীরূহে পরিণত করেছি। সেই বৃক্ষ হাজার বছর পর্যন্ত সবুজ শ্যামল ছায়াময় ছিল। তার ছায়ায় কত মসজিদ হলো, কত মাদ্‌রাসা হলো, হলো কত খানকাহ্– ইবাদতখানা। সেখান থেকে সৃষ্টি হলো কত আলিম-উলামা, ফকীহ, মুহাদ্দিস। অথচ অবশেষে তোমাদের সামান্য গাফলতি, আলস্য কিংবা পরস্পরবিরোধ ও বিচ্ছিন্নতার ফলে হাজার বছরের লালিত সেই সোনার বাগিচা মুহূর্তে বিরান হয়ে গেল। সেখানে রইল না কোন প্রাণের ছোঁয়া।

আমি স্পেনে গিয়েছি। সেখান থেকে অন্তরে অসীম ব্যথা নিয়ে ফিরেছি। আল্লাহ্ জানেন, কেন কী ভুলের কারণে স্বর্ণপ্রসবিনী এই মাটি আজ ইসলাম থেকে বঞ্চিত। অথচ একদিন এই স্পেন ছিল উলামা-মাশাইখের কেন্দ্রভূমি। ইকবালের সুর প্রতিধ্বনি হতে লাগল তখন আমার সমগ্র চেতনা জুড়ে।

'আফসোস! কত শত বছর হলো
আকাশ তোমার শোনেনি আযান।'

ইতিহাস আমাদের স্পষ্ট বলে দেয়, অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সমতা অনাবশ্যক। অনেক ক্ষেত্রে একমুঠো অপরাধের কারণে এক আকাশ শাস্তি দেয়া হয়। অনেক সময় দেখা যায় সিদ্ধান্তের সামান্য ভুলের কারণে শত শত বছর ধরে তার খেসারত দিতে হয়। পৃথিবীর কত জাতি, কত সংগঠন ও দল ভুল করেছে। বিশেষ কোন ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখিয়েছে যার পরিণামে যুগ যুগ ধরে

শাস্তি ভোগ করেছে মানুষ। আপনি স্পেনের ইতিহাস পড়ুন। তার পতনের কারণগুলো একটু বিবেচনায় নিন। তাহলে আপনার কাছে পরিষ্কার মনে হবে, আরবদের স্বভাবজাত বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতাই এই পতনের মূল কারণ। রাবী'আ-মুদার, আদনানী-কাহ্তানী আর হিজাযী– ইয়েমেনী নামের পুরনো বিরোধেরই নব সংস্করণ ঘটেছে স্পেনে।

যারা স্পেনে ইসলাম ও মুসলমানদের পতন সম্পর্কে পড়াশোনা করেছেন এবং এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন তারা বলেছেন, এর সবচে বড় কারণ ছিল, আদনানী ও হিজাযীরা চাইতো নেতৃত্ব আমাদের হাতে থাকবে। পক্ষান্তরে কাহ্তানী আর ইয়ামেনীরা চাইতো ক্ষমতা থাকবে আমাদের হাতে। তারা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের প্রতি মনযোগী ছিল না। তারা দক্ষিণ দিক থেকে সংকুচিত হয়ে আসছিল, কিন্তু উত্তরে অগ্রসর হতে সচেষ্ট হয়নি। তারা বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে নিজের মেধা ও যোগ্যতা উদারচিত্তে ব্যয় করেছে। তবে সেখানকার অধিবাসীদের অন্তরে ও জীবন সাহারায় ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এক বিন্দু শ্রম ও মেধা ক্ষয় করেনি। তারা 'মাদীনাতুয-যাহরা'র মত উন্নত শহর আর 'আল-হামরা'র মত দুর্ভেদ্য কেল্লা নির্মাণ করেছে। 'মসজিদে কর্ডোভার'র মত শিল্পনন্দিত সৃষ্টিও তাদেরই উন্নত রুচি ও মনের ফসল। কিন্তু এসব কিছুই কি তাদের পতন ঠেকাতে পেরেছে? আসলে তাদের উচিত ছিল, তাদের প্রতিবেশীদের সামনে ইসলামকে তুলে ধরা। দক্ষিণে পিছু হটবার বদলে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া ছিল তাদের অনিবার্য কর্তব্য। তাদের কর্তব্য ছিল ইউরোপের দিকে এগিয়ে যাওয়া। তারা তা পারেনি। কারণ, তারা তখন ডুবে ছিল সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, কারুশিল্পের দিগন্ত স্পর্শ, শিল্পের নতুন নতুন জগৎ আবিষ্কার ও তার বলিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা আর কাব্যিক চর্চায়। কখনো কখনো মানুষের সাধারণ অপরাধের ফল অনেক দীর্ঘ হয়। কখনো হয় উল্টো। মাঝে মধ্যে কোন কোন জাতি এমন অপরাধ করে বসে–কোন মানুষকে যদি তার উপযুক্ত শাস্তির কথা জিজ্ঞেস করা হয় সে বলবে–পুরো জাতিটাকেই ধ্বংস করে দেয়া উচিত। কিন্তু বাহ্যত দেখা যায় তাদের কিছুই হয়নি। অথচ এক সামান্য এতীম কিংবা অসহায় এক বিধবার বেদনা বিধূর একটি 'আহ' ধ্বনিই সেই জাতিকে, সেই প্রশাসন ও সাম্রাজ্যকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে।

তাই প্রথম ও প্রধান দাবি হলো, আমাদের ইসলাম টিকে থাকতে হবে। আমাদের সবচে বড় কর্তব্য হলো, আমরা যেখানেই থাকবো। আমাদেরকে আমাদের সভ্যতা, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শৃঙ্খলা, বন্ধুত্ব, সৃজনশীল মন-মানস, মানসিক সৃষ্টিশীল ক্ষমতা ও নিরাপত্তার পয়গাম নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে। তাই যে কোন

প্রশ্নেই বিবেচনায় আনতে হবে, এটা আমাদের ইসলামের ওপর কী প্রভাব ফেলবে? অধিকন্তু ভাবতে হবে, এর পরিণামে আমাদের ইসলামী সংস্কৃতি, সমাজবোধ এবং ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিনা!

এ প্রসঙ্গে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে যেটাকে আমি মনে করি তাহলো, আকীদার বিশুদ্ধতা। আল্লাহ্ তালার সাথে ওয়াহদানিয়াতের সম্পর্ক। তাঁকে ব্যতিত অন্য কারও সামনে মাথানত না করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অঙ্গীকার। এতে কোন ত্রুটি হলে আল্লাহর সাহায্যে ঘাটতি হবে। পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা আছে, উম্মতের তাওহীদি বিশ্বাসে যখনই দুর্বলতার সৃষ্টি হয়েছে তখনই তাদের শক্তি ভেঙে পড়েছে। কারণ, মুসলিম মিল্লাতের শক্তি ও প্রতিষ্ঠার মূল উৎস হলো তাওহীদি বিশ্বাস। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ

سَنُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰهُمُ النَّارُ ۚ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ۔ [ال عمران/١٥١]

‘আমি কাফেরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করেছি– কারণ, তারা কোনরূপ দলীল-প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহ’র সাথে শরীক স্থাপন করেছে। তাদের ঠিকানা, জাহান্নাম। অত্যাচারীদের ঠিকানা বড়ই মন্দ।’ (আলে-ইমরান ; ১৫১)

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন—

“যারা বাছুরকে মা'বুদ বানিয়েছে তারা তাদের প্রভুর ক্রোধে পতিত হবে, অপমানিত হবে পার্থিব জীবনে। যারা অপবাদ আরোপ করে তাদেরকে আমি এরূপ শাস্তিই দিয়ে থাকি।” (আল–আ'রাফ ঃ ১৫২)

শিরক হলো দুর্বলতার উৎস। এটা শিরকের অনিবার্য বৈশিষ্ট্য। এটা আল্লাহ-ই সৃষ্টি করেছেন। সকল কিছুর মধ্যেই তিনি একটা বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। বিষের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। পানির একটা বৈশিষ্ট্য আছে– আছে আগুনের আলাদা বৈশিষ্ট্য। একই নিয়মে শিরক ও অংশীদারিত্বেরও। এরও একটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে। তাহলো দুর্বলতা। আর তাওহীদের বৈশিষ্ট্য হলো শক্তি ও বীরত্ব। তাওহীদে বিশ্বাসীজনদের ভেতর শংকা ও ভয় থাকে না। তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন আকীদার পরিশুদ্ধি। বিশুদ্ধ তাওহীদি বিশ্বাস নির্মাণ।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হতে হবে হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মতো, যে সম্পর্কের শিক্ষা দিয়েছে পবিত্র কুরআন। হৃদয়ের মণিকোঠায় প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এই সম্পর্ক। কারণ, শয়তান তো সর্বদাই তাকে থাকে। সুযোগ পেলেই হামলা করে বসবে। আর চোর তো সেখানেই যায়, যেখানে সম্পদ থাকে। তাই যার ভেতরে তাওহীদ ও ইসলামের সম্পদ আছে, হৃদয় যার ঈমানের ধনে ধনবান, ভয় ও শংকা তো তারই। আমাদের সৌভাগ্য, আমরা এই মহান সম্পদ লাভ করেছি। আসমানী কিতাব আর এ দেশের মাটিই আমাদের এই বিশ্বাস ও সম্পদ দিয়েছে। এই সম্পদ ও বিশ্বাস এখন এদেশের মাটি ও ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু তাই আমাদের নিশ্চিন্ত ও নিঃশংক হবার সুযোগ নেই।

দ্বিতীয়ত, যে বিষয়টিকে আমি খুবই জরুরি মনে করি তাহলো–পরস্পর দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছিন্নতা। এর মধ্যেও আল্লাহ তাআলা দুর্বলতা রেখেছেন।

ইরশাদ হয়েছে—

أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ - [الانفال/٤٦]

'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। পরস্পরে লড়াই করো না– তাহলে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের শক্তি চলে যাবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।' (আনফাল ঃ ৪৭)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার বলেছেন ঃ তোমরা পরস্পর লড়াই-ঝগড়া করো না, তাহলে তোমাদের শক্তি বিপর্যয় ঘটবে এবং তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে। দল ও প্রতিষ্ঠানের আধিক্য এটা জীবনচাঞ্চল্যের বিকাশ। এটার আমি বিরোধিতা করি না। কিন্তু প্রতি মহল্লায় একটি করে দল হবে, প্রতি ঘরের একটি করে পতাকা হবে, হবে একটি নিজস্ব সংগঠন, এটা ঠিক নয়।

তৃতীয়ত, যে কারণে ভুল ও দুর্বলতার সৃষ্টি হয় সেটা হল, পার্থিব জীবন ও সম্পদের প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসা। আমি কোন প্রমাণ কিংবা সাক্ষী পেশ করছি না। আমি বলছি, যে কোনভাবেই অর্থ, পদ কিংবা উন্নতি আসুক তা অবশ্যই পেতে হবে– চাই সেটা জাতি-ধর্মের পক্ষে হোক বা বিপক্ষে—এই ধারণা নিতান্তই দুনিয়াপ্রীতির আলামত। এটা আশংকার বিষয়।

চতুর্থ বিষয়টি হল সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক স্খলন ও বিপর্যয়। অপব্যয়, রেওয়াজপূজা, অহেতুক বিষয়ে বাড়াবাড়ি, সামাজিক অহংকার ও গর্ব –এগুলোও ভয়ানক শংকার বিষয়। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে—

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّاقَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ٥

'আমি যখনই কোন জনপদে কোন ভীতি-প্রদর্শক পাঠিয়েছি তখনই সেখানকার বিত্তবানরা বলেছে ঃ তোমাদেরকে যে জীবন-দর্শন দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে— আমরা তা স্বীকার করি না।' [সাবা ঃ ৩৪]

তাই আমি বলি, সাংস্কৃতিক বাড়াবাড়ি থেকে উঠে আসতে হবে। বিয়ে শাদী ইত্যাকার আচার-অনুষ্ঠানে বড় মানুষী ফুটাবার যে মহড়া প্রদর্শিত হয়, বাদশাহী আমিরী রেওয়াজের যে নাটক মঞ্চস্থ হয় জমকালো আসরে– এখন কি এগুলোর সময়? এখনও কি গরীব ভাইদের প্রতি তাকাবার সময় হয়নি?

আজ যা প্রয়োজন তাহলো, আমাদের চারিত্রিক প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ়তা। অস্থিরতা ও ছোটাছুটি মোটেই কাম্য নয়। আজ এপথে, কাল ওপথে –এটা মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়, বরং এটা একটা ধ্বংসাত্মক রোগ। এখন প্রমাণ করা উচিত, আমাদের একটি নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত জীবনধারা আছে। আমরা জীবন ধারণ ও বিশ্বাসে কারও অনুগত–অনুসারী নই।

আমাদের দুর্বলতার আরেকটি বড় কারণ হলো, আবেগপ্রবণতা। এটা কোন কোন অঞ্চলে খুব প্রবল। নিয়ন্ত্রণমুক্ত এই আবেগপ্রবণতা অনেক সময় বড় ধরনের অনিষ্ট ডেকে আনে। অনেক ক্ষেত্রে ভুল ও তাৎক্ষণিক এই আবেগ অনেক ঐতিহাসিক বিপর্যয় ও দুর্ঘটনার জন্ম দিয়ে বসে। অধিকন্তু এই বুদ্ধিমুক্ত আবেগ যদি কোন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষ থেকে হয় তাও কথা। কিন্তু এটা যদি বড় দল কিংবা জাতিকে পেয়ে বসে তখন তো বাঁচার পথ থাকে না; বরং ভয়ানক লজ্জাজনক অপমানকর ফলাফল অনিবার্য হয়ে পড়ে।

যখন বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী এবং দল এই পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য কোন অবদান রেখেছে, দৃষ্টিনন্দন স্মরণীয় কর্মমালা সম্পাদন করেছে, দেশ শাসন কিংবা কোন বরণীয় সভ্যতার রূপকার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে কিংবা যখন পৃথিবীর কোন ভূ-খণ্ডে ইসলামের পতাকা উত্তোলন করেছে, দেখা গেছে তখন সেই জাতি

গোষ্ঠী কিংবা সেই দল ছিল অত্যন্ত সুশীল, ধীরমস্তিষ্ক, ধৈর্যশীল, দরাজদিল এবং সেই সাথে সাহসী ও আত্মমর্যাদাপূর্ণ। আর প্রথম যুগের মুসলমানরা তো ছিলেন এসব গুণাবলীর সর্বোত্তম নমুনা।

আমি একবার এক মজলিসে বলেছিলাম, আমি এই মাত্র এই শহরে প্রবেশ করার সময় লক্ষ্য করলাম–আমার সামনে ট্যাংকার। ট্যাংকারের গায়ে লেখা আছে– Higlly Inflamable. অর্থাৎ এটা দ্রুত এবং অতিমাত্রায় অগ্নি ধারক ও উত্তেজক। আমি মনে করি, এটা পেট্রলের সংজ্ঞা হতে পারে। এটা কোন মুসলমানের সংজ্ঞা হতে পারে না। সামান্য কথায় ফেটে পড়া, উত্তেজিত হয়ে ওঠা, আগ-পর ফলাফলের কথা না ভেবে কোন কিছু ঘটিয়ে ফেলা– এটা কোন মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। এটা সত্যিই একটা মারাত্মক রোগ যার দ্রুত চিকিৎসা হওয়া দরকার। আমাদের নেতৃবৃন্দ, ইসলামের মহান দাঈ, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও ইসলাহ সংশোধনের যারা দায়িত্বশীল তাদের এদিকে দ্রুত দৃষ্টি দেয়া সময়ের অপরিহার্য দাবি বলে আমি মনে করি।

আমি বিশ্বাস করি, আমাদের প্রতি আল্লাহর সাাহয্য অনিবার্য। তবে তার জন্য প্রয়োজন তাঁর সাহায্য আসার পথে অন্তরায় সব দোষ ও কারণগুলো সমূলে ঝেড়ে ফেলা। আমাদের অস্তিত্ব ও অবস্থানে দুর্বলতা সৃষ্টি করে যেসব বিষয় সেগুলো যথাশীঘ্র মুছে ফেলা। অনন্তর আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হয় যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে, সেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যে রঞ্জিত ও মণ্ডিত উঠতে হবে আমাদেরকে এক্ষণি। মনে রাখতে হবে, আল্লাহর সাহায্য এলেই কেবল আমরা বিজয়ী হতে পারবো– অন্যথায় নয়। ইরশাদ হয়েছে–

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ -

আল্লাহ যদি তোমাদেরকে সাহায্য করেন তাহলে
কেউ তোমাদের ওপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর তিনি
যদি তোমাদের অপমানিত করেন তাহলে কে তোমাদেরকে
সাহায্য করবে? মুমিনদের উচিত একমাত্র আল্লাহ'র ওপরই
ভরসা করা। (আলে-ইমরান ঃ ১৬০)

উলামায়ে কেরাম ঃ মর্যাদা ও দায়িত্ব

* আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী *[১৯৮২সালে হায়দারাবাদে প্রদত্ত একটি ভাষণ। সেখানকার প্রখ্যাত এডভোকেট জামীলুদ্দীন সাহেবের বাসায় আয়োজিত এক মাহ্ফিলে বিপুল সংখ্যক উলামায়ে কেরাম এবং মাদরাসা পরিচালকদের উদ্দেশে প্রদত্ত এই ভাষণে সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে উলামায়ে কিরামের মর্যাদা, দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি।]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ [مائدة/٨]

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর জন্যে ন্যায় সাক্ষ্য দাও।' (মাইদা ঃ ৮)

হযরতে উলামায়ে কেরামের এই মহতি মাহ্ফিলে কোন কথা আরয করা অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ। বিজ্ঞজনদের একটা কথা আছে ঃ لكل مقام مقال

'যেমন পাত্র তেমন কথা।' সে হিসেবে আমিও চেষ্টা করব আজকের এই মওকা মাফিক–অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী কিছু কথা আরয করতে।

অনেকে তো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা থেকেও অনেক বড় বড় ফলাফল বের করেন। দৈনন্দিন জীবনের টুকিটাকি ঘটনা মন্থন করে আবিষ্কার করেন অনেক বড় বড় শিক্ষা। এক্ষেত্রে বিশ্ববিখ্যাত কবি শেখ সা'দীর কোন জুড়ি নেই। অবশ্য উপমা স্থাপন ও সৃষ্টির ক্ষেত্রে মাওলানা রূমীকেও অদ্বিতীয় বলতে হবে। তাঁরা ছোট ছোট ঘটনা থেকে গভীরতম শিক্ষা সন্দেশ তুলে আনতেন। আমিও আমার অনুভব-অনুভূতি ও স্বীয় শিক্ষা থেকে একটি কথা বলতে চাই। আপনারা জানেন, আমি দিল্লি থেকে হায়দারাবাদে এসেছি। আমি যে গাড়িতে করে এসেছি সে গাড়ি কত দিক মুখ করে চলেছে। চলার পথে কত এলাকা পার করে এসেছে তা তো কেবল আল্লাহই মা'লুম। কিন্তু কম্পাস রীতিমতই আমাকে কিবলা বলে দিয়েছি। গাড়ির দিক পরিবর্তন, আবহাওয়ার বিবর্তন কোন অবস্থারই সে তোয়াক্কা করেনি। গাড়ির গতি বদল, দিকের পরিবর্তন আর পরিবেশের বৈচিত্র্য

সর্বাবস্থায়ই সে আমাকে যথা কিবলা নির্দেশ করে গেছে। এসবের পরিবর্তন বিবর্তন দ্বারা সে মোটেই প্রভাবিত হয়নি।

আমি যখন ভাবলাম, বিষয়টি আমাকে খুব আলোড়িত করল। আমার খানিকটা লোভও হল, একটি মানব-নির্মিত জড় পদার্থ এতটা বিশ্বস্ত নির্দেশক অথচ আমরা?

আমার মনে হল, একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র অথচ অবস্থার শত উত্থান-পতনেও সে তার দায়িত্ববোধে অবিচল। সে তার নীতি ও আদর্শে এতটা অনড় যে, গাড়ি কোন দিকে যাচ্ছে সে দিকে তার মোটেও লক্ষ্য নেই। এমনকি মানুষ (যে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জাতি) সেও এদিক সেদিক মুখ ফেরাচ্ছে। কিন্তু 'কম্পাস' তার অবস্থানে অবিচল। সদা স্থির স্বীয় দায়িত্ব পালনে। সে এক মুহূর্তের জন্যেও পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে না। একটিবারের জন্যও ভুল দিক-নির্দেশনা দিচ্ছে না। আর তার নির্দেশনামত আমরা নামায পড়ছি। একটি কম্পাসের এই স্থিরতা ও বিশ্বস্ততা আমার মর্যাদাবোধে দারুণভাবে আঘাত করেছে। আমাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছে। সাথে সাথে আমার ভেতরে এই শিক্ষাও জেগেছে– আচ্ছা, একটি কম্পাস, সেও তার পারিপার্শ্বিকতার পরোয়া করে না। সেও তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যায় না। সর্বদাই নিরলসভাবে কিবলা নির্দেশ করে যাচ্ছে। স্বীয় বাহককে দিক বাতলে যাচ্ছে। স্বীয় দায়িত্বে এক বিন্দু আগ-পর নেই, অবহেলা নেই। আর তখনই আমার মনে হল, উলামায়ে কেরামকেও কম্পাসের মত হওয়া উচিত। তাঁদের হওয়া উচিত কম্পাসের মত অটল অবিচল দৃঢ়সিদ্ধান্ত। অবস্থা যাই হোক, যুগের হাওয়া যেদিকেই চলুক, আলেমকে থাকতে হবে স্বীয় অবস্থানে অনড়-পাহাড়সম স্থির। যুগ ও সময় বাগে না এলে, বাতাস কেবল উল্টো বইলে নিজেকে যুগের মত করে সাজাবার, নিজেকে বাতাসের সরল স্রোতে ভাসিয়ে দেয়ার কোন অবকাশ নেই; বরং যুগ ও সময়কে বাগে আনতে চেষ্টা করতে হবে–প্রয়োজনে চলতে হবে বাতাসের উল্টো দিকে। আল্লামা ইকবালের ভাষায়—

حدیث کم نظران ہے تو بانح مانه بساز

زمانح باتونح سازدتوبازمانح ستیز

স্থূল দৃষ্টিজনরা বলে, চল যেদিক বাতাস চলে
অথচ তোমার কর্তব্য হলো,
যুগের হাওয়াকে অনুগত করা।

মূলত উলামায়ে কেরামের অবস্থা এমনই হওয়া উচিত। কারণ, এই উম্মতের মধ্যে উলামায়ে কেরামের একটি ভিন্ন মর্যাদা ও গুরুত্ব আছে। তাছাড়া মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ তাআলা একটি স্বতন্ত্র কিবলাও দিয়েছেন। সর্বাবস্থায় তাঁকে সেই কিবলামুখী থাকতে হয়। অধিকন্তু নামাযে যেভাবে তাকে এক সুনির্দিষ্ট কিবলা পবিত্র বায়তুল্লাহ শরীফ মুখী থাকতে হয়, তেমনিভাবে তার সকল প্রয়োজন প্রত্যাশা সৎকর্ম ও সততা সকল ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট থাকতে হয় প্রকৃত কিবলা প্রকৃত মনিব মহান আল্লাহ পাকের প্রতি।

সন্দেহ নেই আজকের মহতি মাহ্‌ফিল আমার জন্যও এক বিরাট সুযোগ। এটা আমার জন্য এক গনীমত। এই গনীমতকে আমি নষ্ট হতে দিতে চাই না। তাই এই মহান সুযোগে আমি আপনাদের খেদমতে দুটো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে খুব সংক্ষেপে আলোকপাত করব।

এক. আকীদা ও ইসলামের আদর্শিক সীমারেখা। এ ক্ষেত্রে হযরাতে উলামায়ে কেরামকে হতে হবে সম্পূর্ণ কম্পাসের মত। বিশ্বাস ও আদর্শের ক্ষেত্রে তাকে হতে হবে সদা অবিচল দৃঢ়চেতা এক বিশ্বস্ত রাহবর। এক্ষেত্রে যত বড় ব্যক্তিই তার সামনে আসুক তাকে তোয়াক্কা করার সুযোগ নেই। বোঝা-পড়া করার অবকাশ নেই। তাঁর কর্তব্য যথার্থ কিবলা বলে দেয়া। শাশ্বত সত্য বিশ্বাস ও আদর্শের নির্দেশনাই তার অলংঘনীয় কর্তব্য। এক হল হিকমত ও কৌশল, আরেক হল ছাড়াছাড়ি ও আপস-রফা। দুটো এক নয়। একজন মানুষ কৌশলের সাথে সত্য কথা বলতে পারে। কিন্তু তাই বলে আপস করার, সত্যের ক্ষেত্রে ছাড় দেয়ার কোন সুযোগ নেই। আর হিকমতের কথা তো স্বয়ং আল্লাহ-ই বলেছেন :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

'ডাকো আল্লাহর পথে কৌশলপূর্ণ ও সুন্দরতম কথার মাধ্যমে।'

পক্ষান্তরে আপস ও ছাড়াছাড়ির ক্ষেত্রে উচ্চারিত হয়েছে কঠিন হুঁশিয়ারী।

ودوا لوتدهنوا فيدهنون -

তারা চায়, আপনি যদি ছাড় দেন তাহলে তারাও ছাড় দেবে। (কলম ৯)

বরং আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে পরিষ্কার আদেশ দিয়েছেন–

فاصدع بما تومر واعرض عن المشركين

'আপনাকে যে কাজের আদেশ করা হয়েছে আপনি তার অকুণ্ঠ ঘোষণা দিন এবং মুশরিকদের প্রতি কানও দেবেন না।' অর্থাৎ এটা ইসলাম ও শিরকের সীমান্ত বিষয়। এখানে আপস-রফার কোন অবকাশ নেই। মুশরিকদের কথার

প্রতি কর্ণপাত করার কোন সুযোগ নেই। নম্রতা, বিনয় আর উদারতা ভিন্ন বিষয়। তাওহীদ– আল্লাহ'র একত্ববাদ, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নত ও আদর্শ এবং ইসলামের স্পষ্ট আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে পরিষ্কার আদেশ হল, শরীয়ত যা বলেছে তাই উচ্চারণ করে যেতে হবে নিঃশংক চিত্তে। এজন্যেই আয়াতের শেষাংশে 'আর মুশরিকদের প্রতি কানও দেবেন না' বলে দেয়া হয়েছে। বিষয়টি দিবালোকের মত স্পষ্ট করে তোলাই আয়াতের লক্ষ্য। সুতরাং হকপন্থী উলামায়ে কেরামের কর্তব্য হল–তাওহীদ, রিসালাত ইত্যাকার শরীয়ত নির্ধারিত বিষয়গুলো সম্পর্কে পরিষ্কার কথা বলা। যেখানে কোন দ্বিধা থাকবে না, জড়তা থাকবে না। তবে বলতে হবে কৌশলের সাথে। কবি গালিবের ভাষায় যেন এমন না হয়—

کہتے ہیں وہ بھلے لیکن بری طرح

'বলে ভাল কিন্তু মন্দভাবে।'

অর্থাৎ যা বলে তা ভাল বলে। কিন্তু বলার ধরন খুবই মন্দ, অসুন্দর। বর্ণনা ও উপস্থাপনায় এই অসুন্দর অনেক অনিষ্ট বয়ে আনে। অনেক ক্ষেত্রে মহা বিবাদ খাড়া হয়ে যায়। তাই যাতে কোন ভুল ধারণা সৃষ্টি না হয় সে জন্য সংযত ভাষায় বিধৌত আচরণের মাধ্যমেই তাঁকে এগুতে হবে অত্যন্ত ধীর ও দৃঢ়ভাবে। উলামায়ে কেরামের কৌশলপূর্ণ এই গতি ও চিন্তার ফলাফল হিসেবেই অদ্যাবধি আমরা ইসলামকে দিবস সূর্যের মত পরিষ্কার আলোকিত অবস্থায় পেয়েছি। যেখানে আলো-আধাঁরের মিশ্রণ নেই, দুধ ও পানির অস্পষ্টতা নেই।

যে ব্যক্তি ধ্বংস হতে চায় তার ধ্বংস হবার সুযোগ বিপুল। পুরো উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে সে ধ্বংসের নোনা সাগরে। কিন্তু তাই বলে সে ইসলামের ধারক-বাহকদেরকে দোষারোপ করতে পারবে না। মুসলিম উম্মাহর বিশাল ইতিহাসের প্রতি যদি গভীরভাবে দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে– তাদের ইতিহাসের দীর্ঘ পরিসরে এমন একটি বছর নেই, যাতে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ ব্যাপকভাবে ভ্রষ্টতা ও গোমরাহীর শিকার হয়েছে। বিচ্ছিন্ন ঘটনা তো বিচ্ছিন্ন-ই। এ মর্মে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বলেছেন 'আমার উম্মত একই সাথে কখনো ভ্রান্তির শিকার হবে না।'

অথচ আমরা যদি ইহুদী জাতির প্রতি তাকাই তাহলে দেখবো, ইহুদী জাতি তার সূচনাকালেই বিকৃতির শিকার হয়েছে। আর খৃষ্ট ধর্মতো তার শৈশবেই এক বিভ্রান্তির মোড়কে বাধা পড়ে। অতঃপর বছরের পর বছর ধরে সেভাবেই এগুতে থাকে। তাই পবিত্র কুরআনে তাদের 'দাল্লীন'(উদভ্রান্ত) বলা হয়েছে।

কিন্তু ইসলামের বেলায় এমন কিছুই ঘটেনি। সব ধরনের ধাঁধা, বিপর্যয়, বিভ্রান্তি ও বিকৃতি থেকে মুক্ত ও নিরাপদ এই দীন। আজ অবধি তাওহীদ ও শিরকের পার্থক্য, সুন্নত ও বিদআতের ব্যবধান, ইসলাম ও জাহেলিয়াতের ফারাক, ইসলামী সভ্যতা ও জীবনবোধ এবং অনৈসলামিক সভ্যতা ও জীবনবোধের ভিন্নতা একেবারে স্পষ্ট। হ্যাঁ, কোন দেশ বা জাতি বিশেষ কোন সময়, বিশেষ কোন কারণে যদি কোন যড়যন্ত্রের শিকার হয় সেটা ভিন্ন কথা। অবশ্য এক্ষেত্রেও উলামায়ে কেরাম সতর্ক থাকেন এবং তার সংশোধনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন।

আল্লাহ তাআলা সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ -

অর্থাৎ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সত্যের পতাকাবাহী হয়ে যাও।' আল্লাহর ফৌজ কথাটা আমাদের ভাষায় একটি বিদ্রূপাত্মক শব্দ হলেও আয়াতে ব্যবহৃত (কাওয়ামীনা লিল্লাহ) বাক্যটির পরিভাষাগত অর্থ কিন্তু 'আল্লাহর ফৌজ'-এর মতোই হয়। এখানে আল্লাহর ফৌজের– সত্যের পতাকাবাহীদের বিশদ মর্যাদাই বিধৃত হয়েছে। অর্থাৎ যাঁরা আল্লাহর ফৌজ, যাঁরা সত্যের পতাকাবাহী তাঁরা সদা স্বীয় দায়িত্ব পালনে থাকে অতন্দ্র প্রহরীর মত জাগ্রত-সচেতন। কেউ জিজ্ঞেস করুক আর নাই করুক, কেউ ডাকুক আর নাই ডাকুক তাঁরা তাঁদের কর্তব্য আদায়ে কুণ্ঠিত হয় না– দ্বিধান্বিত হয় না। এখানে যদিও মুসলমানদের লক্ষ্য করেই কথাটি বলা হয়েছে তবুও উলামায়ে কেরামের গুরুত্ব বেশি। কারণ, তাঁরা উম্মতের বিশেষ শ্রেণী। তাই যদি সাধারণ উম্মতকে পতাকাবাহী হিসেবে জবাবদিহি করতে হয় তাহলে উলামায়ে কেরামকে জবাবদিহি করতে হবে বিশ্বময় মুসলিম সমাজ সম্পর্কে। মুসলিম সমাজ কোথায় কিভাবে স্খলিত হচ্ছে, বিচ্যুত হচ্ছে তার পূর্ণ খোঁজ-খবর নেয়ার দায়িত্ব; তাদেরকে সতর্ক ও সংশোধন করার দায়িত্ব উলামায়ে কেরামের।

উলামায়ে কেরামের আরেকটি বড় দায়িত্ব হল, মুসলমানদের জীবন-পদ্ধতি, রাষ্ট্র পরিস্থিতি, পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন ও চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ খবর রাখা। জনবিচ্ছিন্ন অবস্থা উলামায়ে কেরামের জন্য নয়। কারণ, জনগণ যখন উলামায়ে কেরাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে তখন তারা কাল্পনিক জগতের বাসিন্দা হয়ে পড়বে। কল্পনা বিলাসিতার স্রোত তাদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে দীন থেকে অনেক দূরে। অভ্যস্ত হয়ে পড়বে তখন নিক্ষিপ্ত-পতিত জীবন যাপনে। দীনের আহ্বান তখন আর সাড়া জাগাতে পারবে না তাদের অন্তরে। দীনী দাওয়াত ও

সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব আদায় হয়ে পড়বে তখন অসম্ভব। শুধু তাই নয় বরং তারা ইসলাম ও ইসলামী জীবনবোধের প্রতি হয়ে পড়বে বীতশ্রদ্ধ। তখন ইসলামের পতাকাবাহীদের জন্য এই দেশে অবস্থান করা হয়ে পড়বে ভীষণ মুশকিল। স্বগৃহে নির্বাসিত জীবনযাপনে বাধ্য হবেন তখন সম্মানিত উলামায়ে কেরাম।

ইতিহাস তো আমাদের একথাই বলে, যে দেশে উলামায়ে কেরাম সব কিছুই করেছেন–কিন্তু স্বীয় সম্প্রদায়কে তাদের জীবন চিন্তা সম্পর্কে সচেতন করেননি, মুসলানদের তাদের আত্মপরিচয় ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ করে তোলেননি, আদর্শ উপমাময় নাগরিক জীবনপদ্ধতি শিক্ষা দেননি, নিজেদের জাতির নেতৃত্বের মর্যাদায় ভূষিত করতে সচেষ্ট হননি সে দেশ ও জাতি তাদের মূল্যায়ন করেনি, বুকে ধরে রাখেনি; বরং ভক্ষিত বমনীয় গ্রাসের মতোই উদ্‌গীরণ করে ফেলেছে। কারণ, তাঁরা নিজেরা নিজেদের আসন তৈরি করেন নি। আজ আপনারা-আপনাদের চারপাশের দিকে দৃষ্টি মেলে দেখুন। আজ আপনাদের দেশ ও জাতি বাস্তবমুখী বুদ্ধিদীপ্ত নেতৃত্বের খুবই মুহতাজ।

আপনারা যদি আপনাদের দেশে সকল মুসলমানকে তাহাজ্জুদগুযার বানিয়ে ফেলেন, সকলকেই খোদাভীরু পরহেযগারে রূপান্তরিত করে ফেলেন আর তাদেরকে তাদের চারপাশ সম্পর্কে সচেতন না করেন, তারা যদি তাদের দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুই না জানে, দেশ ডুবছে, অসভ্যতা অপসংস্কৃতি দেশকে গ্রাস করে ফেলছে, দেশ জুড়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগের তুফান বইছে অথচ তারা কিছুই জানে না, তাহলে তাহাজ্জুদতো পরের কথা, তারা তো একসময় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও পড়তে পারবে না। কারণ, ভয়ংকর এই সমাজ ও পরিবেশে তাদের কোন স্থান নেই। কারণ, আপনারা তাদেরকে তাদের অবস্থান সৃষ্টির কথা বলেননি। তাদের বরফায়িত ধমনীতে চেতনার আগুন জ্বালতে পারেননি।

সুতরাং আপনাদের ভাবতে হবে। সাধারণ মুসলমানদের জীবন ও ভবিষ্যৎ নির্মাণের কথা ভাবতেই হবে। তাদেরকে আদর্শ নিষ্ঠাবান নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে। কারণ, তারাইতো দেশকে ভয়াল ভ্রান্তি ও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবে। প্রয়োজনে জীবন কুরবান করে দেবে। তারা যদি সচেতন না হয় তাহলে তো ইবাদত-বন্দেগী দীনী প্রতীকী কর্মকাণ্ড অনেক দূরের কথা– মসজিদ সংরক্ষণই তো হয়ে পড়বে ভারি মুশকিল। মুসলমানরা তো তখন স্বদেশে বিদেশী হয়ে পড়বে। স্বদেশী জীবন সভ্যতা সম্পর্কে অজ্ঞ, সমকালীন আন্দোলন

ও রাজনীতি সম্পর্কে বেখবর, রাষ্ট্রীয় আইন ও রীতিনীতি সম্পর্কে অন্ধ জাতির দ্বারাতো নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না বরং এমন জাতি তাদের অস্তিত্বও ধরে রাখতে পারে না। নেতৃত্ব! সে তো অনেক উপরের কথা।

মিসর বিজেতা সাহাবী হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) যখন মিসর জয় করেন তখন আল্লাহ তাআলাই হয়তো তাঁর হৃদয়ে– বিশ্বাসে একথার উদ্রেক করেছিলেন– মিসর শত বছর নয় বরং হাজার হাজার বছর ইসলামকে বুকে ধরে রাখবে। মিসর ইসলামের কেন্দ্রভূমি হিজায থেকে খুব দূরে ছিল না। রোমীয় শাসনদণ্ডও তখন ভেঙে গেছে। কিবতী খৃষ্টীয় শাসন ব্যবস্থাও বেদখল হয়ে পড়েছে। দেশ এখন কেবল মুসলমানদের– মুসলিম আরবদের। অথচ এই মুহূর্তে হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা.) মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন–

أنتم فى رباط دائم

'মনে রেখ! তোমরা সর্বক্ষণই শত্রুর মুখোমুখি– সীমান্ত প্রহরীর মত।' তাই তোমাদেরকে সর্বদাই অতন্দ্র প্রহরীর মত সজাগ সচেতন থাকতে হবে। গাফলতি আর আলসেমীর কোন সুযোগ নেই। অজ্ঞতা আর অজ্ঞতার ভান করারও কোন অবকাশ নেই।

আমাদের দেশের সার্বিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে এখন। প্রতিবেশী দেশ ও পরিস্থিতি আমাদের দেশকে রীতিমত নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক পরাশক্তিকেও উপেক্ষা করার উপায় এদেশের নেই। দেশে সমগ্র চিন্তা-দর্শন সক্রিয়। শত সংস্কৃতির বিপ্লব চলছে। সভ্যতা বিধ্বংসী শত আন্দোলন চলছে। শিক্ষানীতি রীতিমত পরিবর্তন হচ্ছে। মাঝে মধ্যে তো আমাদের বিশ্বাস ও ধর্মীয় মূল চিন্তার ওপরও আঘাত করছে। তাছাড়া আধুনিক বিজ্ঞান এবং ভাষাও নতুন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন প্রয়োজন আমাদের অবস্থার গভীর পর্যালোচনা। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার চিন্তা করা উচিত এবং সেজন্যে উচিত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

মুসলমানদের বলতে হবে, দেশ ও জাতির প্রতি তোমাদের অনেক কিছু করার আছে। দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা তোমাদের কর্তব্য। তোমরা যদি হযরত ইউসুফ (আ)-এর নমুনা পেশ করতে পার তাহলে ভবিষ্যতে তোমাদের অনেক বড় দায়িত্বের অধিকারী করা হবে–প্রতিষ্ঠিত করা হবে নেতৃত্বের আসনে।

হযরত ইউসুফ (আ) লক্ষ্য করেছিলেন, তাঁর দেশে যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি স্বীয় যোগ্যতা, মানবতার প্রতি অপরিসীম কল্যাণকামিতা, বন্ধুত্ব ও ইনসাফের সাক্ষর

না রাখতে পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর দীনও প্রচার পাবে না, তাঁর ধর্ম দর্শনও সে দেশে কোন মর্যাদার আসন পাবে না; বরং এর জন্য প্রয়োজন স্বীয় যোগ্যতার সাক্ষর ও তাঁর প্রতি আল্লাহর বান্দাদের নিঃশর্ত আকর্ষণ, তবেই এ দেশে আল্লাহর নাম নেয়া সম্ভব। তাঁর মহিমাময় নামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। অবশেষে হয়েছেও তাই। সুতরাং আজ আমরা যারা মুসলমান তাদেরকে স্বীয় যোগ্যতার সাক্ষর রাখতে হবে। প্রমাণ করতে হবে, আমাদের বাদ দিয়ে দেশ চলতে অক্ষম। আমাদের কাঁধে ভর না করে দেশ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য স্পর্শ করতে পারবে না বরং আমরা না থাকলে এই দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে।

মনে রাখতে হবে, আমরা যদি আমাদের চারপাশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেই, উষ্ণ-শীতল কোন আবহাওয়াই যদি আমাদেরকে স্পর্শ না করে বরং আমরা যদি এয়ারকন্ডিশন ঘরে অবস্থান করতে থাকি–যেখানে গরমের জ্বালা নেই–ঠাণ্ডার আগ্রাসন নেই, তাহলে সেটা হবে নিজেদের প্রতি চরম অবিচার। আর আমাদের ধর্মের প্রতিও হবে বিনাশী অত্যাচার। তাছাড়া রাষ্ট্রের একটা অংশ তো আর আরেকটা অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না বরং মিশে থাকতে হবে। তবে আমি অন্যের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার কথা বলছি না। সেটা বলবই বা কেন! সব কিছুরই একটা সীমারেখা আছে। তাই উলামায়ে কেরামকে অন্যদের সাথে থাকতে হবে দাওয়াত ও ফিকিরের সাথে। সর্বাবস্থায় স্বীয় পয়গাম তুলে ধরতে হবে জাতির সামনে। স্বীয় চাল-চলন, বোল-সম্ভাষণ সব কিছুতেই থাকতে হবে নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতির সবুজ আঁচড়। কোন অবস্থাতেই স্বীয় সভ্যতার স্বাতন্ত্র্যবোধকে পরিহার করা যাবে না–জলাঞ্জলি দেয়া যাবে না।

আমার পরামর্শ হল, আপনারা জীবনধারা থেকে আলাদা হবেন না। কারণ, কেউ যদি স্বীয় সমাজ থেকে আলাদা হয়ে পড়ে তাহলে সে সমাজ থেকে দূরে সরে পড়ে। জীবন্ত মানবগোষ্ঠীতে তার আর কোন স্থান থাকে না। আর আমি ইসলামকে এতটা সংকীর্ণ মনে করি না যে, সমাজ জীবনের অবস্থা, পরিস্থিতি ও চাহিদার দিকে তাকাতে গেলে ইসলাম ছুটে যাবে। বিশ্বাস ভেঙে যাবে– দুর্বল হয়ে পড়বে। আমাদের পূর্বসূরিগণতো রাজত্ব করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন অথচ তাঁদের তাহাজ্জুদ ছুটেনি। একটি সাধারণ সুন্নতও হাতছাড়া হয়নি। আমাদের আদর্শ তো তাঁরাই।

হযরত সালমান ফারিসী (রা.)! ইরাকের গভর্নর ছিলেন। মাদায়েনের রাজধানীতে থাকতেন। খানা খেতে বসেছেন। দস্তরখান থেকে সামান্য একটু খাবার মাটিতে পড়ে গেছে। গভর্নর সালমান ফারসী (রা.) স্বহস্তে তুলে পরিষ্কার

করে খেতে লাগলেন। উপস্থিত একজন বলল আপনি গভর্নর হয়ে এই কাজ করলেন? তখন তিনি উত্তরে বললেন : আমি তোমাদের মত বেকুফবদের কথায় আমার প্রিয়তম নবীজীর সুন্নত ছেড়ে দেব? এটা ঠিক নয় যে, আগুন এলে পানি থাকবে না আর পানি এলে আগুন থাকবে না। এটা ভুল ধারণা। আপনি ইচ্ছা করলে পূর্ণ সততা, নিষ্ঠা, আদর্শ, তাকওয়া ও দীনদারী রক্ষা করেও একজন পরিপূর্ণ সফল নাগরিক হতে পারেন।

আজ বিশ্বজুড়ে সাংস্কৃতিক যুদ্ধ চলছে। শুধু আমাদের দেশেই নয়। বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোর অবস্থাও অনুরূপ। আরব দেশগুলো পর্যন্ত এখন ইউরোপীয় তপ্তবাষ্পে পুড়ছে। আমেরিকা থেকে উদ্ভূত প্রসবিত নতুন নতুন ফিৎনা গ্রাস করে চলছে দেশের পর দেশ। ইসলাম ও কুফুরীর লড়াই সর্বত্র। সময়ের আধুনিক পাহাড়সম সমস্যা থেকে চোখ বুঝে থাকার তো কোন উপায় নেই।

তাই উলামায়ে কেরামের কর্তব্য হল, শরীয়তের প্রত্যয়পূর্ণ আকীদা-বিশ্বাস, স্পষ্ট বিধানাবলী সম্পর্কে পাহাড়ের মত অবিচল আর লোহার মত কঠিন থাকা, পক্ষান্তরে সমাজের আধুনিক সমস্যাবলীর সমাধান ও যুগের সার্বিক চাহিদা পূরণে পূর্ণ বিচক্ষণতা, হৃদ্যতা ও আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসা। আমরা যদি এই দুটো দিকে সমানে উত্তীর্ণ হতে পারি তাহলে আমরা ক্ষমতার মসনদে উঠে যাব এমনটি নয়। বরং আমি বলি, এই দুটো দায়িত্ব পালনে যথাযথভাবে সচেষ্ট হলে নেতৃত্ব নিজে ছুটে আসবে আমাদের কাছে।

মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক ও নাগরিক চেতনা সৃষ্টি করা একান্ত অপরিহার্য বিষয়। মুসলমানরা যে মহল্লায় থাকবে তাদের আচরণ, চাল-চলন দেখেই যেন মনে হয় এটা মুসলমানদের মহল্লা। মুসলমানদের মধ্যে অবিনাশী চিরজাগ্রত এই চেতনা সৃষ্টি উলামায়ে কেরামেরই দায়িত্ব। তাঁরা যদি তাঁদের এ দায়িত্ব পালনে যথাযথভাবে সচেষ্ট হোন তাহলে সত্যিই তাঁরা এক আলোকিত ভবিষ্যৎ নির্মাণে সক্ষম হবেন- ইনশাআল্লাহ।

তাবলীগ ঃ উম্মাহ্'র অনিবার্য দায়িত্ব

بسم الله الرحمن الرحيم

وَاَنْفِقُوا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

সম্মানিত বন্ধুরা

মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারায় ইরশাদ করেন– 'তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং স্বীয় হস্তকে ধ্বংসের মধ্যে ফেল না। তোমরা সৎকর্ম কর। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা উত্তমরূপে সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।'

পবিত্র কুরআনের একটি বহুল পঠিত আয়াত এটি। অনেক মুসলমানেরই এটি মুখস্থও আছে। অনেকে এই আয়াতটি সঠিক কিংবা ভুল পন্থায় ব্যবহারও করেন। মূলত এই আয়াতের সঠিক মর্ম, যথার্থ ব্যাখ্যা এবং তা অবতীর্ণ হবার সঠিক স্থান খুব সহজেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে একটি ঘটনা থেকে। আমি আপনাদেরকে সেই ঘটনাই শোনাচ্ছি।

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু আয়্যুব আনসারী (রা)

একবারের ঘটনা। মুসলমানদের এক ফৌজী কাফেলা। তাঁদের মধ্যে হযরতে সাহাবায়ে কেরামও আছেন। তারা তখন ইস্তাম্বুল অবরোধ করেছিলেন। আল্লাহর অনুগ্রহে সেই কনস্টান্টিপোল ও ইস্তাম্বুল এখন মুসলমানদের হাতে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম যখন অবরোধ করেন তখনই তার বিজয় আল্লাহর দরবারে ম ুর ছিল না। আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন রকম। অন্য সময় অন্যের হাতে এর বিজয় লিখে রেখেছিলেন তিনি। যদিও তখনকার সেই ফৌজী দলে বড় বড় সুবিখ্যাত সাহাবী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সায়্যিদুনা হযরত আবু আয়্যুব আনসারী (রা)ও ছিলেন। তিনি সাহাবী ছিলেন। অনেক কামালাত ও পূণ্যতায় দীপ্ত ছিলেন তাঁর জীবন। সেই সাথে এমন এক মহান গৌরবের অধিকারী ছিলেন তিনি যা রীতিমতো সকলের কাছেই ঈর্ষার বিষয়। অবশ্য ঈর্ষার বিষয় হওয়াই উঁচিত। হ্যাঁ, সেই বিরল গৌরব ও সম্মানের বিষয়টি হলো, তিনি ছিলেন সমগ্র জাহানের

মেযবান যাঁকে আল্লাহ তাআলা সারা দুনিয়ার সকলকে দাওয়াত খাওয়াবার, যিয়াফত করবার জন্য, আল্লাহর নেয়ামতের অসীম ভাণ্ডারকে কাজে লাগাবার জন্যই প্রেরণ করেছিলেন। কী যে ভাগ্য তাঁর, তিনি সেই মহান সত্তারই মেযবান। সারা জাহানের যিয়াফতের লক্ষ্যে যাঁর আগমন তাঁরই মেযবান হযরত আবু আয়্যুব আনসারী (রা)! সারা জাহানের মেযবানই তাঁর ঘরে মেহমান।

এটা এমন এক মর্যাদা, যে কারণে সকল মুসলমানই বিষয়টিকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতেন। আলাদা গুরুত্বের সাথে দেখতেন হযরত আবু আয়্যুব আনসারী (রা) কে। তাঁর প্রতিটি কথাই তাঁরা যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে শুনতেন ও বিবেচনা করতেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মেযবান হওয়ার অর্থ তো কেবল এতটুকুই নয়– তিনি আল্লাহর রাসূলের আতিথ্য করেছেন, মেহমানদারি করেছেন; বরং এর অর্থ হলো, তিনিই সর্বপ্রথম খুবই কাছে থেকে রাসূল (স)কে দেখেছেন। বুঝেছেনও। তাই অন্য মুসলমানগণের মতো তাঁর যেভাবে ইসলামকে বোঝার, ইসলামের রূহ ও আল্লাহর কালামের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করার সুযোগ ও অধিকার ছিল সেই সাথে তাঁর মধ্যে এক ভিন্ন মাত্রা এই ছিল, তিনি দীর্ঘ সময় হযরত (স)-এর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ লাভ করেছেন। এ কারণে হযরত (স)-এর পবিত্র সত্তার প্রতি ঘনিষ্ঠতা, হযরতের সাথে নিবিড় আন্তরিকতা তাঁর মধ্যে সৃষ্টি করেছিল ঈমানী ফারাসাত, গভীর আত্মিক উৎকর্ষতা, দৃষ্টির অলৌকিক তীক্ষ্নতা ও বিশ্বাসিক কঠিন দীপ্ত উপলব্ধি। সেই আলোকে তিনি অনেক বড় বড় কাজ আনজাম দিয়েছেন। অবদানের বিশাল ফিরিস্তি নির্মাণ করেছেন। আমরা যে অবরোধ ঘটনার কথা বলছি সেই দলে হযরত আবু আয়্যুব আনসারী (রা)ও উপস্থিত ছিলেন।

জিহাদ চলাকালীন সময়ে এক ব্যক্তি ভুল ব্যাখ্যা করল কুরআনের

মুসলমানদের ঘেরাও কর্মসূচি অব্যাহত। লড়াইও চলছে প্রচণ্ড। ঠিক এরই মধ্যে দেখা গেল এক সাহাবী সৈন্যদের কাতার ভেঙে একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে, যেখানে সাধারণত কমাণ্ডাররা অবস্থান করে। অতঃপর তরঙ্গায়িত যোদ্ধাদের কাতার লণ্ডভণ্ড করে পুনরায় বেরিয়ে আসছে আপন স্থানে। তাকে দেখে মনে হয় যেন কোন পাক্কা খেলোয়াড় দর্শকদের কৌশল ও নৈপুণ্য দেখিয়ে বিমোহিত করছে।

শত্রুর ব্যূহ ভেদ করে তাদের হৃদয় ভেঙে পুনরায় কঠিন বীরত্বের সাথে বারবার ফিরে আসার এই দৃশ্য দেখে কোন কোন মুসলমানের মুখ থেকে অলক্ষ্যেই এ কথাটি বেরিয়ে এলো– হায়, হায়! এতো কুরআনে কারীমের রীতির বিপরীত কাজ করছে। আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন–

"وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ"

"তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না।"

অর্থাৎ জেনে-বুঝে এমন কাজ করোনা যার অনিবার্য পরিণতিই হলো ধ্বংস। এটা তো এক রকমের আত্মহননের মতো, আত্মঘাতী আঘাতের মতো। তাই এভাবে একাকী শত্রুদের কাতারে ঢুকে পড়াটা তার জন্য ঠিক হচ্ছে না। শত্রুদের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এটা অনুচিত, অবৈধ।

একথা শুনে চকিত হলেন হযরত আবু আয়্যুব আনসারী (রা)। বললেন, বন্ধুরা! এই আয়াত যা তোমরা পাঠ করছো এর সঠিক ব্যাখ্যা আমাকে জিজ্ঞেস কর। এটা তো আমাদের ঘরেরই আয়াত। কারণ, এটা আনসারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতসমূহের একটি। তাঁর এই কথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম (রা) তাঁর প্রতি নিবিষ্ট হলেন। তাঁরা গভীর মনযোগসহ তাকালেন। দেখি, নবীজীর মেযবান এই আয়াতের কী ব্যাখ্যা দেন, কী তাফসীর শোনান।

সাহাবায়ে কেরামের সংগ্রাম ও তার ফলাফল

আবু আয়্যুব আনসারী (রা) বললেন ঃ এই আয়াত তখন অবতীর্ণ হয়েছে যখন ইসলাম মদীনায় এলো। সর্বত্র আলোড়ন সৃষ্টি হলো। মুসলমান ঘর-দোর ছেড়ে চোখ বন্ধ করে নিমগ্ন হলো দীনী চিন্তায়, দীনী কর্মে। কিসের বাগান, কিসের খামার, কিসের দোকান, কিসের ঘর আর কিসের সন্তান, কিসের সংসার! সব কিছুই দীনের জন্য কুরবান। সকল পূঁজি দীনের জন্য নিবেদিত। সে এক বিস্ময়কর প্রেমপাগল দশা। ইসলামের খেদমত ও সেবার নেশা সব কিছুকে পরিপূর্ণভাবে গ্রাস করে নিয়েছে। কারো মধ্যেই ঘর-সংসারের কোন হুঁশ ছিল না।

স্বাভাবিকভাবেই এই কুরবানী ও উৎসর্গী স্বভাবের একটা প্রভাব সমাজ জীবনে পড়েছে। এটা আল্লাহ পাকের বিধানও বটে। হলোও তাই। দেখা গেল আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য দেউলিয়া। বাগ-বাগিচা বিরান। ক্ষেত-খামার বরবাদ।

অর্থাৎ জীবিকার সকল আয়োজন লণ্ড-ভণ্ড। কিন্তু ইসলাম ঘরে ঘরে প্রসারিত হতে লাগল আলো কিংবা বৃষ্টির মত। এখন আর পূর্বেকার দশা নেই। সকলে তখনও মুসলমান হয়নি। তবে হাজার হাজার মুসলমানের আবাস এখন মদীনা। ঈমানের দৌলতে পূর্ণ অনেকে। অনেকেই এখন খোদার রহমতে সিক্ত। সেই সংখ্যা শত-সহস্র।

দীনী কর্মের মাঝে ছুটির চিন্তা

দীনী কর্ম ও আচরণের এই উত্তাল মুহূর্তে আমাদের মনে জাগল, এখন আর আগের মত পরিপূর্ণ একাগ্রতার পরিপূর্ণ সময় ও মনোনিবেশের সাথে দীনী খেদমত ও সংগ্রামের প্রয়োজন নেই। তাছাড়া অবস্থার প্রেক্ষিতে তো বিধানেরও পরির্তন ঘটে। তখন এই বিধান ছিল, কোন ব্যক্তিই ঘরে বসে থাকতে পারবে না। স্বীয় জান-মাল, সন্তান, ব্যবসা সব কিছুর চেয়ে প্রিয় হতে হবে ইসলাম। ইসলামের চেয়ে প্রিয় কোন কিছু হতে পারবে না। প্রয়োজন হলে সকল কিছু বিসর্জন দিয়ে ইসলামের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিয়েছেন। আমরা এটা করে দেখিয়েছি। ইসলামের ডাকে পরিপূর্ণভাবেই সাড়া দিয়েছি।

আল্লাহর রহমতে এখন ইসলামের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। মুসলমানের সংখ্যা বেড়েছে। ইসলামের সৈনিকের সংখ্যা এখন অনেক। তাই এখন যদি কিছুদিনের জন্য আমরা একটু ছুটি নিই, অবসর যাপন করি তাহলে অসুবিধার কি আছে? তাছাড়া ছুটির বিধান তো সকল ধর্ম-দর্শনেই আছে।

তাছাড়া তাঁরা তো একথা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারতো না যে, পরিপূর্ণভাবে দীনী কাজ ছেড়ে দেবে। তাঁরা ভাবতেও পারতো না, এখনতো ইসলামের সেবকের সংখ্যা অনেক। কাজেই আমরা একেবারে অবসর হয়ে যাই। অতএব হে রাসূল! আমাদেরকে ছুটি দিয়ে দিন! আমরা আমাদের কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, ঘর-দোর দেখি! তারা বরং ভেবেছিল সাময়িক অবসরের কথা! তাছাড়া মানুষতো যুদ্ধ চলাকালীনও ছুটি নেয়। এমন অনেক জটিল কাজই তো আছে, যেখানে একজন এলে আরেকজন ছুটিতে যায়। একটু মনপ্রাণ তাজা করে আসে। একটু আরাম করে ঘরের জরুরি কাজ-কাম সেরে পূর্ণ উদ্যমে কাজে ফিরে আসে। সাহাবায়ে কেরাম (রা) ছুটি বলতে এমনই সাময়িক ছুটির কথাই ভেবেছিলেন মাত্র।

ছুটির পরিণতি

হযরত আবু আয়্যুব আনসারী (রা) বলেন ঃ আমরা কেবল মনে মনে এই সাময়িক ছুটির কথা ভেবেছিলাম মাত্র। আর তখনই এই আয়াত অবতীর্ণ হলো ঃ 'তোমাদের মনে এ কেমন ভয়ংকর বিষাক্ত চিন্তার উদয় হয়েছে? এ তো শয়তানী প্রবঞ্চনা! তোমরা আল্লাহ'র কাজ থেকে ছুটি নিতে চাচ্ছ? তোমরা এর পরিণতির কথা জান কি? তোমরা যা ভেবেছ এর ফলাফল কিন্তু তত সহজ নয়। হ্যাঁ, তোমরা যা ভেবেছ তাতো হবেই।

তোমাদের ফসল ভাল হবে। ক্ষেত-খামার শ্যামলিমায় ভরে উঠবে। তোমাদের দোকানপাটও জমে উঠবে। তোমাদের দোকানপাটে তো এখন মাটি পড়ে আছে। তাতে হয়তো ক্রেতার ভিড়ও হবে। ক্ষুদ্র পুঁজির ওসব দোকানেও হয়তো রোজানা দশ বিশ দিরহাম লাভ হতে শুরু করবে।

তোমাদের বাগান তো শুকিয়েই গেছে। পানি দিলে হয়তো তরতাজা হয়ে উঠবে। তবে এর ফল প্রকাশ পাবে দুই দিকে। এক তো হলো, তোমাদের ব্যক্তিগত বিষয়। তাহলো, আল্লাহ্ তাআলার দীনের খাদেম ও সেবকদের খাতায় তোমাদের যে নাম ছিল তা কেটে দেয়া হবে। তোমরা তখন তাদের-ই অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে, যাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে। যাদের নাম জানোয়ার আর পশুদের সাথে লেখা হয়ে গেছে। তাদের কাজ গরু-ছাগলের মত খানাপিনা করা। উদর পূর্তির ফিকির করা এবং উদর ভর্তির ব্যবস্থা হলেই জীবন-স্বপ্ন শেষ।

এখন তোমাদের নাম আল্লাহর নবীর বিপ্লবী সিপাহিদের ফিরিস্তীতে সমুজ্জ্বল। তোমরা দীনের জন্য উৎসর্গীতপ্রাণ। মানবতার ফসলকে সবুজ-সুন্দর আয়োজনে তোমাদের নাম সবার শীর্ষে। পৃথিবীর নির্মাতা, পৃথিবীকে সবুজ সন্দুর ফুলে-ফলে নতুন স্বাদে নতুন ব্যাঞ্জনায় গড়ে তুলছে যারা তোমরা এখন তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

এই যে পৃথিবীটা, এটা তো একটা জুয়া ঘর, জানোয়ারদের আস্তাবল কিংবা মানুষের সমাধিস্থান। যেখানে খানা-পিনা কামাই অর্জন ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যায় না। আজ এই পৃথিবীকে নতুন করে জীবিত করা, মৃত পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার করার মত মহান কর্ম তো তোমাদের ভাগ্যেই লিপিবদ্ধ ছিল। তোমরা যা ভেবেছো তাতে তো তোমাদের নাম মহান এই লিস্ট থেকে কেটে দেয়া হবে।

আর এই যে দুনিয়া তা ইতিপূর্বে আল্লাহ থেকে দূরে সরে পড়েছিল। আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল। তোমাদের উসিলায় আজ তারা খোদার দরবারে সিজদাবনত। যারা ছিল বিদ্রোহী তারাই এখন আল্লাহ'র ওলী। তারাই এখন আরিফ, আবিদ ও আলিম। এই পৃথিবীর মুক্তিদূত কাফেলায় এখন তাদের নাম অঙ্কিত। যদি তোমরা ছুটিতে যাও তাহলে এই সিদ্ধান্তও বদলে যাবে।

অতএব তোমরা যদি কায়-কারবার, কৃষি খামার আর ঘর-দোরের পেছনে পড় তাহলে প্রথম ক্ষতি হবে এই, পবিত্র লিস্ট থেকে তোমাদের নাম বাদ পড়ে যাবে। তোমাদের নাম তখন জীবিত কিংবা মৃতের খাতায়ই পাওয়া যাবে। অন্য কোথাও নয়।

অবশ্য দ্বিতীয় ক্ষতিটি এর চেয়েও ভয়ংকর। তাহলো এই পৃথিবীর তরে আল্লাহ তাআলা যে রহমত মুক্তি ও হেদায়েতের দরোজা খুলে দিয়েছিলেন তা রুদ্ধ করে দেবেন। এই পৃথিবী সম্পর্কে আল্লাহর যে ফয়সালা হয়েছিল– এই পৃথিবীবাসী আল্লাহকে জানবে, আল্লাহর পথে চলবে, একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করবে, পৃথিবীর সমুদয় মানবগোষ্ঠী নিজের মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবগত হবে, জীবনের প্রকৃত মকসুদ সম্পর্কে জানবে বিশ্বাস করবে– তাহলে সেই পথ ও ফয়সালাও বদলে যাবে। এই ক্ষতি খুবই ভয়ংকর ও ব্যাপক।

সাহস ও দৃষ্টিভঙ্গির উচ্চতা ও দৃঢ়তা—সবই দীনী কর্ম ও সাধনার ফসল

আমরা চতুষ্পদ হিংস্র প্রাণীও নই, আবার ফিরিশতাও নই। আমরা হলাম মানুষ। আমাদের আদেশ করা হয়েছে, আমরা যাতে প্রয়োজনমত জীবিকার ব্যবস্থা করে তারপর আল্লাহর কাজে নিমগ্ন হই। আল্লাহর দীনকে যেন পৃথিবীর কোণে কোণে পৌঁছে দিই। আল্লাহর ডাক ও পয়গামকে যেন পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিই। যদি আমরা এই দায়িত্ব পালনে অক্ষম ও ব্যর্থ হই তাহলে সমগ্র মানবতা, সমুদয় সৃষ্টি জগৎ আল্লাহর এই ফয়েয ও করুণা থেকে বঞ্চিত হবে। আল্লাহ মানবতা ও বিশ্ব সৃষ্টির প্রতি যে নেয়ামত বর্ষণের ইচ্ছা করেছেন তা আটকে দেবেন।

আল্লাহ'র ফয়েয ও রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ হলো ধ্বংস। এই ধ্বংস তোমাদের জন্যও, পৃথিবীর অন্য সকলের জন্যও। তোমরা যদি পবিত্র দীন ও দীনী চিন্তা বর্জন করো ও তার মাথায় কোদাল চালাও যার ওপর তোমাদের নিবাস তাহলে এই পৃথিবীতে তোমাদের যেমন কোন নাম-চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না,

তেমনি তোমরা তখন কত রোগের শিকার হবে তার কি কোন হিসাব থাকবে। আর কত মানুষের কত শত্রুর মুখের গ্রাসে পরিণত হবে তোমরা তারই বা কি হিসাব থাকবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তোমাদের সকল ক্ষেত্রে সকল বিপদ থেকেই রক্ষা করেছেন। স্বীয় শ্রেষ্ঠ রাসূলের সঙ্গলাভের জন্য নির্বাচন করেছেন। তোমাদের এমন বলে বলীয়ান করেছেন, যা থেকে অন্যরা অবশ্যই বঞ্চিত। নতুন হিম্মত, নতুন সাহস, নতুন স্বপ্ন ও নতুন শক্তিতে পুষ্ট করেছেন তোমাদেরকে। তোমাদের সংকল্প সুউচ্চ করেছেন। তোমাদের দৃষ্টিকে আলোকিত করেছেন। মনে রেখ এসকলই ইসলামের বরকতে।

শানে নুযূলের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

এত কিছুর পরও যদি তোমরা ইসলাম থেকে হাত তুলে নাও, ইসলামের সহযোগিতা ও সংগ্রাম থেকে সরে দাঁড়াও তাহলে তোমাদেরও ক্ষতি হবে এবং সেই ক্ষতি হবে আত্মহত্যার মতো ক্ষতি। তাছাড়া সেটা হবে পৃথিবীর জন্য সকলের জন্য গোমরাহী, ভ্রান্তি ও ধ্বংসের কারণ। পৃথিবী একটি ধারায় চলতে চলতে হঠাৎ পড়ে যাবে অন্য ধারায়। এই পৃথিবী এখন গোমরাহী থেকে হেদায়াতের দিকে, দুর্ভাগ্য থেকে সৌভাগ্যের দিকে, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এবং মূর্খতা থেকে শিক্ষার দিকে যাচ্ছে। ক্রমে অগ্রসর হচ্ছে। অগ্রসর হয়েছে তাও নয়। তবে আশার আলো জ্বলছে।

কিন্তু এই মুহূর্তে যদি তোমরা হাত তুলে নাও, ইসলামের খেদমত ও দাওয়াত থেকে পেছনে ফিরে যাও, এখন যদি নিমগ্ন হও ঘর-দোর, সন্তান-সন্তুতির তরবিয়াত ও লালন-পালনে, তাহলে এর অর্থ হবে আল্লাহ'র দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নফস ও রিপুর দাসত্বে নিমগ্ন হওয়া। যদি তাই হয় তাহলে এই পৃথিবীর জন্য আল্লাহ তাআলা কল্যাণের দরোজা বন্ধ করে দিবেন। ধ্বংসই হবে তখন এই জগৎ ও জগদ্বাসীর চূড়ান্ত পরিণতি। মূলত এই প্রেক্ষিতে ও বিস্তারিত এই অবস্থার আলোকেই উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল।

সন্দেহ নেই একটি বিরাট-বিস্তীর্ণ অর্থের অধিকারী এই আয়াত। এর ফলাফলও খুবই সুদূর প্রসারী ও শিকড়স্পর্শী। কোন এক ব্যক্তির আত্মহত্যার প্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। কোন এক ব্যক্তির ধ্বংসও এই আয়াতের আলোচ্য বিষয় নয়; বরং এর চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। এর সম্পর্ক পূর্ণ মানবমণ্ডলীর সাথে। পুরো মানব পরিবার ও তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। এই আয়াতে তাদের কথা

বলা হয়েছে, যারা এই পৃথিবীতে হেদায়াতের কাজ করবে, মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে টেনে আনবে। পৃথিবীকে শেখাবে নতুন তত্ত্ব, নতুন হাকীকত, জীবনের নতুন মর্ম। এদের প্রচেষ্টায় মানুষ নিবিষ্ট হবে নতুন মনযিলের দিকে।

এই আয়াতে তাঁদের কথা বলা হয়েছে, যাঁদের দ্বারা মানুষ আল্লাহকে চিনবে। যাঁদের পরশ পেয়ে মানুষ তার বর্তমানের প্রতি আক্ষেপ করবে– হায়! আমি এ কেমন জীবন যাপন করছি? এতো চতুষ্পদ জানোয়ারদের জীবন! খানা-পিনা অতঃপর বিছানার উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়া! তারপর উঠে গরু আর ঘোড়ার মত কাজে লেগে পড়া! একোন মানুষের জীবন হলো?

এই আয়াত তাদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা পূর্ণ মানব গোষ্ঠীকে চকিত করবে। যাঁদের পরশে, যাঁদের দাওয়াতে, যাঁদের কর্মের প্রভাবে, যাঁদের তাবলিগী উষ্ণতায় মানুষের মগজ ও চিন্তা ভাবতে বাধ্য হবে, ধাক্কা খাবে; বলতে বাধ্য হবে–না, না! এ কোন জীবন নয়।

বলুন, তারা এই কাজ থেকে যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, মহান এই দায়িত্ব থেকে যদি পালিয়ে যায় তাহলে এই পৃথিবীবাসীকে বাঁচাবে এমন কে আছে যে মানব জাতিকে উচ্চ চিন্তা দর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবে? কে আছে যে মানুষকে বলবে ঃ হে মানবজাতি! এ কেমন জীবন তোমাদের? যদি ভাল কাপড়ে সজ্জিত থাকার নামই কোন জীবন হতো তাহলে তো এটা মৃতদের জীবন। সুকণ্ঠ ও যেখানে সেখানে চরে বেড়ানোই যদি জীবনের সার হয় তাহলে তো বুলবুলিরা তোমাদের চেয়ে ভাল জীবনের অধিকারী। আর যদি অন্যদের পেট কেটে, অন্যদের রক্ত পান করে বেঁচে থাকার নামই জীবন হয়, মানব জীবনের লক্ষ্য হয়, তাহলে তো সেটা বাঘের জীবন মাত্র।

বন্ধুরা আমার!

যদি এক ব্যক্তি হাতের মুঠোর ভেতর জীবনটা রেখে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয় তাহলে সে হয়তো কখনো জীবন্ত-সুস্থ্ অবস্থায় ফিরেও আসে। হযরত খালিদ (রা)-এর চেয়ে যুদ্ধের ময়দানে নিজের জীবনকে আর বেশি ঝুঁকির মুখে কে ফেলেছে বলুন? জীবনে যিনি সর্বদাই মৃত্যুকে একটি হাসির বিষয় মনে করেছেন। খেলনার বিষয় মনে করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে জীবন দান, ইসলামের জন্য মস্তক দানের ইতিহাসে হযরত খালিদ (রা)-এর নাম কত উজ্জ্বল সে কথা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু হযরত খালিদ (রা)-এর মৃত্যু যখন সমুপস্থিত এবং তিনি বিছানায় শায়িত। একেবারে স্বাভাবিক মৃত্যুর পথে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওলীদ–ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। তখন তিনি বলতে লাগলেন ঃ

জীবনে যেখানেই আল্লাহর পথে জীবনদানের সুযোগ এসেছে সেখানেই আমি নিজের জীবনকে পেশ করেছি। কিন্তু আল্লাহর কী মহিমা! আজ আমি বিছানায় পড়ে মরতে যাচ্ছি।

فلاناهت اعين الجبنا - فلاناهت اعين الجبنا - فلاناهت اعين الجبنا -

'আল্লাহ করুন, কাপুরুষদের নিদ্রা নসীব না হোক।' কারণ, আমার মত জীবনকে ভয়ংকর ঝুঁকির মুখে আর কে ঠেলে দিত? আর কে ছিল এমন যে আমার মত শাহাদাতের পেয়ালা সন্ধান করে ফিরতো? কিন্তু আল্লাহ্ প্রমাণ করে দিচ্ছেন, আজ আমি অসুস্থ। বিছানায় পড়ে আছি। বিছানায় পড়ে মরতে যাচ্ছি। আর যারা ভীরু কাপুরুষ, ভয় করে পালিয়ে বেড়াত তারা এখন কোথায়? সকলেই মৃত্যুর দরিয়ায় হারিয়ে গেছে। তারা তাদের অনুমানের ভিত্তিতে, প্রস্তুতি ও সতর্কতার সকল অস্ত্র ব্যবহার করেও নিজেদের রক্ষা করতে পারেনি। মরণ হয়েছে তাদের শেষ ঠিকানা।

বন্ধুরা !

এটাকে আত্মহত্যা বলে না, এক ব্যক্তি কোন সুযোগে নিজের জীবন নিয়ে খেলতে গিয়ে স্বীয় ব্যবসা-বাণিজ্যকে আশংকায় ফেলে দিল। হয়তো বা হুঁশিয়ার ও সতর্কজনদের পরামর্শ উপেক্ষা করে বসল। যখন বিজ্ঞজনরা বলছিল, ভাই! এখন তো ব্যবসা মূলতবী করার সময় নয়। এটা দোকান ছেড়ে আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়ার সময় নয়। এই সময়টা কাজে লাগানো উচিত। এখনই ব্যবসার মূল সময়। কিন্তু সে তাদের পরামর্শের বিপরীতটাই গ্রহণ করল।

যারা কখনো নিজের চোখের উপর পট্টি বেঁধে নেয়, কিংবা দেখেও না দেখার ভান করে তারা কখনোই আত্মহত্যা করে না; বরং আত্মহত্যা করে তারা, যারা জীবনের লক্ষ্য ও টার্গেট ভুলে গিয়ে নফস ও রিপুর দাসত্বে হারিয়ে যায়। একজন মুসলমান কিংবা একটি মুসলিম দলের জন্য আত্মহত্যা হলো আল্লাহ্ পাকের দেয়া জীবন লক্ষ্য ভুলে যাওয়া। আল্লাহ নির্দেশিত পথ ও টার্গেট থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়া। আল্লাহ তাআলা যে মহান লক্ষ্য ও কর্মের জন্য এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন তা ভুলে গিয়ে অন্য পথে চালিত হওয়া। ইরশাদ হয়েছে—

'তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। তোমাদের সৃষ্টিই মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্য। তোমরা সৎকর্মের আদেশ করবে, অন্যায় কর্মে বাধা দেবে এবং ঈমান আনবে আল্লাহ'র প্রতি।' [আলে ইমরান ঃ ১১০]

বলা বাহুল্য, মহান এই লক্ষেই মুসলমানদের সৃষ্টি। সুতরাং তোমরা যদি এই লক্ষ্যকে তাকে তুলে রাখ আর আকণ্ঠ ডুবে যাও ব্যবসা-বাণিজ্যে– বরং পরিপূর্ণভাবে 'ব্যবসায়ী মানুষ' হয়ে যাও, অধিকন্তু মানুষ তোমাদের বড় ব্যবসায়ী বলবে, বড় বিত্তবান বলবে এই যদি হয় তোমাদের দৃষ্টিতে মহা প্রশংসা– তাহলে এটাই আত্মহত্যা। নিজের ব্যবসা, ব্যবসায়ী পরিচিতি, সাংসারিক চাহিদা আর পেটের দাবিই যদি তোমাদের কাছে সবচে বড় দাবি হয় তাহলে মনে রেখ, কুরআনের ভাষায় যে কোন ব্যক্তি ও দলের জন্য এটাই আত্মহত্যা, এটাই প্রকৃত মৃত্যু। মুহাজিরদের মর্যাদা ছিল অনেক বেশি। আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ لا رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ۔

'মুহাজির ও আনসারদের মধ্য থেকে যারা প্রথম ও অগ্রণী এবং যারা উত্তমরূপে তাদের অনুসরণকারী আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তাঁরাও সন্তুষ্ট আল্লাহর প্রতি।' [তাওবা ; ১০০]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন –

'তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে আল্লাহর পথে খরচ করেছে, লড়াই করেছে তারা আর যারা পরে খরচ করেছে এবং লড়াই করেছে– সমান হতে পারে না।' [হাদীদ]

সার-কথা হলো, জীবনের অবিনশ্বর চিরন্তন সফলতা ও প্রকৃত সৌভাগ্যের কথা ভুলে গিয়ে–স্বীয় জীবন ও প্রচেষ্টাকে নিশ্চিত ও অনিবার্য ধ্বংস ও আশংকার মধ্যে ঠেলে দেয়াটাই হলো প্রকৃত আত্মহত্যা।

রূহের হেকমত

এ প্রসঙ্গে আমি আপনাদের বলব, আসুন আমরা আমাদের বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা করি। আমরা জানি, এটা ইউরোপ অঞ্চল। তাছাড়া সুদূর ভারত থেকে এ পর্যন্ত আমাদের আগমন কোন আকস্মিক ঘটনাও নয়; বরং আল্লাহ তাআলা বিশেষ কোন হেকমতের অধীনেই আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। অবস্থা যাই হোক, আসবাব ও উপকরণ যেমনই হোক, পরিস্থিতি রাজনৈতিক হোক আর অর্থনৈতিক হোক, চাই সেটার সম্পর্ক ভারতবর্ষ হোক কিংবা ইউরোপের সাধারণ প্রেক্ষাপটই হোক– যাই হোক– বলব, এটা আল্লাহ

তাআলার একটা হেকমত ও রহমত ছিল যে, মুসলমানদের তথা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতদের মধ্যে চাই স্বচ্ছতা, সৃজনশীলতা, যোগ্যতা, বিদ্যা, সৌন্দর্য, সৌকর্য, মেধা ও শিল্প–হাজার বিবেচনায় তারা যত দুর্বলই হোক না কেন- আল্লাহ তাআলা তাদেরকে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও ইখতিয়ার দান করেছেন, এমন এক অপার্থিব শক্তি ও ক্ষমতা দান করেছেন, যার কারণে ইউরোপের এই সাদা জাতি এই পৃথিবীতে দেড়শ-দু'শ বছর পর্যন্ত রাজত্বের ডংকা বাজিয়েছে। পূর্ব-পশ্চিমে যারা শাসনের পতাকা উড়িয়েছে। যারা শূন্যে উড়েছে, পানিতে ভেসে বেড়িয়েছে। যারা সব শেষে চাঁদের পীঠে ঠিকানা নির্মাণের চিন্তায় বিভোর। তারপরও এই ইউরোপবাসীর আঁচল যে সম্পদ থেকে শূন্য তা কি? সেই মহামূল্য সম্পদ হলো ঈমান। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সম্পর্কের দৌলত।

আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে এই মাটিতে পৌঁছে দিয়েছেন। তাই আমি বলতে চাই, আপনাদের জন্য উত্তম পথ কি আর আত্মহত্যা কি? এবং একথা বুঝলেই আপনি আপনার সিদ্ধান্ত নিজে নিজেই করে নিতে পারবেন। আপনার উন্নতির পথ কোনটি আর পতনের পথ কোনটি সে কথাই আমি বলতে চাই– অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায়।

আপনাকে আল্লাহ তাআলা এই রাষ্ট্রে পাঠিয়েছেন, সৃষ্টি করেছেন। এখন যদি আপনি এখানে এসে সার্বক্ষণিকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, আপনার মন মেধা শ্রম শক্তি সব কিছুই যদি বিলীন হয় কেবল এই উপার্জন, অর্থ বিত্ত ও সামাজিক পজিশন নিয়েই, যদি সর্বক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকে এসব নিয়েই, যদি কেবল একথাই ভাবতে থাকেন, আমি বিদেশে এসে কত টাকা আয় করলাম, কত টাকা বাড়িতে পাঠালাম, বাড়িতে কাঁচা ঘর রেখে এসেছিলাম, এখন সেখানে পাকা ঘর উঠল কিনা, সন্তানদের শিক্ষিত তো বানালাম কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য দিতে পারলাম কি-না ইত্যাদি ------।

মনে রাখবেন, আমরা যদি সর্বদা এই চিন্তায়ই ডুবে থাকি তাহলে সে হবে এক সামাজিক এবং ব্যাপকতর আত্মহত্যার শামিল। এক হলো এক ব্যক্তির আত্মহত্যা, আরেক হলো একটি জাতির আত্মহত্যা। কোন জাতির সম্মিলিত আত্মহত্যা নিশ্চয় কোন ব্যক্তির সন্তান আত্মহত্যার চেয়ে অনেক জঘন্য ও মারাত্মক যা যেকোন জাতির অনিবার্য ধ্বংস ও পতন ডেকে আনে।

এমনিতে তো মানুষ ভুল করে। নিজেই নিজের মরণ ডেকে আনে। বিষ খেয়ে মরে যায়। সমুদ্রে লাফ দিয়ে মরে যায়। ছাদ থেকে পড়েও তো মানুষ মারা যায়। এতে করে এই পৃথিবীর রাত-দিনের মধ্যে কোন প্রভাব পড়ে না। কিন্তু যদি কোন জাতি ও সম্প্রদায় আত্মহত্যার চিন্তা করে এবং ভাবে, আমরা সঠিক পথ বর্জন করব। আমরা অন্যায়ের পথে চলব। আমরা পাপের পথে চলব। আমরা আত্মহত্যার পথে চলব। আমরাই আমাদের পথে কাঁটা ছড়াবো। বলুন, যারা নিজেরাই নিজেদের সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত নেয় তাদের প্রতি কে অনুগ্রহ করবে? এমন সম্প্রদায়ের কি কোন আশ্রয় থাকে, ঠিকানা থাকে? এমন জাতির জন্য কি আকাশ কাঁদে, না পৃথিবী?

আমার বন্ধুরা!

আপনাদের জন্য পথ দুটিই–

১. নিরেট ব্যবসায়িক পথ। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেবল এই চিন্তায়ই বিভোর থাকবেন। আমি আমার কথাই বলি। গতকাল আমি একটি মসজিদে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়টা বসা ছিলাম। আমার কানে তখন বিভিন্ন রকমের আওয়াজ আসছিল। কেউ কেউ বসে বসে সে ইউরোপে কী অবস্থায় এসেছিল এখন কী অবস্থায় আছে, তার ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশাল ইতিবৃত্ত শোনাচ্ছে সে। এ তো হলো ছোট্ট একটি উপমা। শুক্রবারে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত দুআ কবুলের বিশেষ সময়টিতে যা আমি দেখলাম। বলুন, দুআ কবুল হওয়ার বিশেষ সময়টিতে যদি আমাদের এই অবস্থা হয় তাহলে মসজিদের বাইরে আমাদের অবস্থা কী হবে?

আপনি নিজেই হয়তো অনুমান করে থাকবেন, একজন ইংরেজ যখন পাঁচ মিনিট পরিশ্রম করে আমরা তখন সাতদিন পরিশ্রম করি। একজন ইংরেজ মানুষের মতো পরিশ্রম করলে আমরা করি ঘোড়ার মত পরিশ্রম। ইংরেজ যদি খানা-পিনা ও আমোদ-ফূর্তি করে তাহলে আমরা ভাবি, আমোদ-ফূর্তি তো দেশেই রেখে এসেছি। আমোদ সেখানে গিয়েই করব।

ইংরেজরা যদি স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে রাখুক! স্বাস্থ্য দিয়ে আমরা কি করব? আমাদের টার্গেটই পয়সা। ইংরেজরা কায়দামত পয়সা কামায়। তাই কামানোর মধ্যেও মজা পায়। আর আমরা? আমাদের ওসব মজা-টজার সাথে কোনই সম্পর্ক নেই। আমরা চাই কেবল পয়সা। আমাদের বেরস হিসাব। কত দিনে কত কামালাম!

বন্ধুরা!

যদি ইউরোপে আসার পর আপনাদের মানসিকতা এই হয় তাহলে মনে রাখবেন আপনারা এদেশের জন্যও একটি দাগ এবং ইসলামের জন্যও কলংক স্বরূপ। কারণ, আপনারা হলেন ইসলামের দরোজা স্বরূপ। আমি আপনাদের একটি ছোট্ট উপমা দিচ্ছি।

মনে করুন, যদি এদেশে আপনাদের তথা মুসলমানদের আগমন না ঘটতো। শুধুই নিরেট ব্যবসায়ী ও পেটপূজারীদেরই আগমন হতো। মুসলমানদের ঘর-বাড়ি সম্পর্কে তাদের যে ধারণা তা যদি না হতো আর এখানে যদি মুসলমানদের ভাল ভাল গ্রন্থগুলো পৌঁছতো। ইসলামের তাবলীগ ও দাওয়াত হতো। আল্লাহর কোন বান্দা যদি উন্নত ইংরেজী ভাষায় পবিত্র কুরআন ও রাসূলে করীম (সা)-এর সীরাত, জীবন ও আদর্শ এই জাতির সামনে উপস্থাপন করতো তাহলে ইংরেজরা মনে করতো, যে পবিত্র মানবের জীবনীগ্রন্থ এটা, তাদের উম্মত জানি কেমন হবে? তাদের চরিত্র জানি কেমন হবে? তাদের জীবন ও বিশ্বাস জানি কেমন হবে? নিশ্চয় হবে অতি পবিত্র। মুকাদ্দাস ও আলোকময় জীবন ও আদর্শের মূর্তপ্রতীক হবেন তারা। এই পৃথিবীর তারাই হবেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। নিশ্চয় তাঁরা হবেন সর্ব বিষয়ে এক আদর্শ-মডেল। আইডিয়েল নমূনা হবেন তারা। তাদের সকল কর্মকাণ্ড নিশ্চয় তাদের নবীর কর্মকাণ্ডের অনুরূপ হবে। তারা নির্ঘাত পরিচ্ছন্ন স্বভাব ও নীতির লোক হবেন। দায়িত্বসচেতন সত্যবাদী, অঙ্গীকার পূরণে বদ্ধপরিকর মানুষ হবেন তারা। মধ্যপন্থী হবেন তারা। নীতিবোধ, আল্লাহর হক ও মানবাধিকারের প্রতি কত জানি যত্নবান তারা। হয়তো এমনও হতে পারতো, এখান থেকে ইংরেজরা ছুটে যেত মুসলমানদের জীবন দেখার জন্য। তারা ছুটে গিয়ে কোন ভাল পরিবেশ কোথাও পেত বা নাই পেতো, হয়তো কুরআনের ডাকে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম কবুল করতো।

কিন্তু ভেবে দেখুন, তাদের সামনে যখন আমরা এসেছি, আমরা কিন্তু তাদের সামনে ইসলামের কোন সুন্দর আদর্শ পেশ করতে পারিনি। ইসলামী জীবনের আলোকিত রূপ আমরা পেশ করতে পরিনি। ইসলামী বিশ্বাস ও আদর্শের আভাদীপ্ত নমুনা আমরা তুলে ধরতে পারিনি। আমরা ইসলামের কাজ করিনি। মুসলমানদের প্রথম কাজ যে হেদায়াত ও আল্লাহকে পাওয়ার সাধনা একথা আমরা বোঝাতে পারিনি। অন্যসব কিছু যে দ্বিতীয় স্থানের বিষয় সেকথা আমরা বলতে পরিনি। তাহলে বলুন, আমরা কি আমাদের প্রতি, ইসলাম ও মানবতার প্রতি জুলুম করিনি?

আপনারা যারা ইউরোপে আছেন, তাদের উদ্দেশে আমি বলব, এটা এক রকমের আত্মহত্যার জীবন বহন করে চলছেন আপনারা। আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি একটু কঠিন শব্দই ব্যবহার করছি যা শুনলেই শরীরের লোমগুলো দাঁড়িয়ে যায়। বলি, এ এক 'হারাম মৃত্যু!' এই হারাম মৃত্যুর জীবনে কে প্রস্তুত বলুন? হাজারবার ফাঁসির মঞ্চে ওঠা, হাজারবার আঘাতে আঘাতে বা ধাপড়াতে ধাপড়াতে মরণ বরণ করাতো হারাম মৃত্যুর চে' ভাল।

আমি বার বার আত্মহত্যা কথাটি বলছি। এর অর্থ এই নয়, শব্দটি আমার কাছে খুবই প্রিয় কিংবা রুচিশীল। কিন্তু কি করব? স্বয়ং কুরআন শরীফ বলেছে ঃ

'তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলে দিও না।'

আর এরই নাম হলো আত্মহত্যা। আত্মহত্যা তো এটাকেই বলে, নিজেই নিজের মৃত্যুর আয়োজন করা।

আপনি যদি এই ইউরোপে অমুসলিমদের মতোই জীবন-যাপন করতে শুরু করেন, সর্বদাই ভোগ ও সম্পদের কথাই ভাবেন, আপনার যদি শরীয়তের আইন-কানুন জানারই ফুরসত না হয়, ইসলামী জীবন গঠনেরই সময় না হয়, হালাল-হারাম জানারই যদি অবসর আপনি না পান, আপনার যদি আল্লাহর খাঁটি বান্দা হওয়ার সময়ই না থাকে, আপনার যদি যেসব ইসলামী দেশে দীনী মারকায ও কেন্দ্র আছে সেখানে গিয়ে নিজেকে শুদ্ধ করার চিন্তা ও চেষ্টা না থাকে তাহলে এটাই আত্মহত্যা। যারা এই আত্মহত্যায় মগ্ন আল্লাহ তাদের জামিন নন।

এই দেশে কাল কী হবে, কে বলতে পারে? অলক্ষণে অশুভ কোন কথা আমি বলব না। বলব, এখানে যত মুসলমান আছে সকলেই ভাল থাকুক, ইজ্জতের সাথে থাকুক। এদেশে মুসলমানদের আগমনের ধারা অব্যাহত থাকুক। মুসলমানদের বিশাল আবাদী প্রতিষ্ঠিত হোক। এটা আমার আন্তরিক দুআ। এখানে এসে তো এখন আত্মতৃপ্তি পাই যে, এসব অট্টালিকায় আগে কী হতো আর এখন আল্লাহ'র নাম নেয়া হয়।

আমি যখন আজ এখানে আলোচনার প্রারম্ভে মাসনুন খুৎবা পাঠ করছিলাম তখন মনে মনে ভাবছিলাম, তখন আমার মন আনন্দে বাগ বাগ হয়ে উঠছিল, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে আজ এখানে দীনের কথা বলার সৌভাগ্য দান করেছেন। অথচ এখন থেকে বিশ বছর পূর্বে আমার নাম ধরে কেউ কেউ আমাকে বলতেন ঃ মিয়া! বিশ বছর পর ইংল্যান্ড গিয়ে গির্জায় বসে কালিমা পাঠ করবে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নাম নেবে। হযরত (সা)-এর নামের উচ্চারণই তো খৃস্টধর্মের প্রতি কঠিন আঘাত। আর সে আঘাতও কোন মাঠে

কিংবা বিবিসি রেডিওতে অথবা কোন বক্তৃতার মঞ্চে নয় বরং সরাসরি গীর্জা ঘরে বসে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর দীনের ধ্বনি উচ্চারণ করব একথা আমার বিশ্বাসই হতো না। দেখুন তো দাওয়াত ও তাবলীগের বরকতে আজ সেই অবিশ্বাস্য বিষয়টিই বাস্তব? জামাআতের বরকতে আজ গীর্জা ঘরে আল্লাহর ইবাদতের আয়োজন চলছে। তাওহীদের কথা হচ্ছে। আল্লাহর দীনের পয়গাম পৌঁছানোর ব্যবস্থা চলছে।

বন্ধুরা !

এখন আমাদের আপনাদের কাজ হবে একটাই ঃ আল্লাহ'র নাম বুলন্দ করা। মুসলিম দেশে মুসলমানরা যে পরিমাণে চেষ্টা করছে এখানে চেষ্টা তারচে' বেশি হতে হবে। মনে রাখবেন, ইসলাম ঠিক থাকলে, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকলে আপনারাও রক্ষিত এবং নিরাপদ থাকবেন।

এ প্রসঙ্গে আমি আপনাদের একটি বিশেষ ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন লক্ষ্য করলেন, অস্ত্র ও মানব শক্তির বিবেচনায় মুসলমানদের বিজয়ের কোন সম্ভাবনাই নেই; বরং পরাজয় অনিবার্য। আর এটা আল্লাহ'র রাসূল কেন একজন সাধারণ জেনারেলও অনুমান করতে পারে। তারপর তিনি কী করলেন? তিনি মাটিতে মাথা রেখে সিজদায় পড়ে গেলেন এবং আল্লাহ'র সমীপে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! মুষ্টিময় এই ক্ষুদ্র দল সম্পর্কে আপনার দরবারে আমি কিছুই বলতে চাই না। এদের কীইবা করার আছে। তাদের কাছে আছেই বা কি! এরা দুর্বল, হতবল। এরা এত অসহায়, এরা এদের ঘরে অসহায় সন্তানদের শূন্য চুলার উপর রেখে এসেছে। যাদের কাছে তলোয়ার নেই। তলোয়ার থাকলে খাপ নেই। দুটি ঘোড়া আর কয়েকটি উট ছাড়া আর কোন বাহনও নেই। এ দিয়ে কি বিজয় হয়? একথা কিভাবে বলি? তবে একথা বলতে পারি, এই অসহায় লোকগুলোর সিদ্ধান্ত হলো, তারা যতদিন এই পৃথিবীতে থাকবে, তাওহীদের-ই দাওয়াত দেবে, তোমার-ই বন্দেগী করবে! এখন তোমার খুশি। তুমি চাইলে এপথ বন্ধ করে দিতে পার, আবার চাইলে অব্যাহতও রাখতে পার।

"اللهم ان تهلك هذه العصابة لم تعبد فى الارض قط"

"হে আল্লাহ! যদি এই ক্ষুদ্র দলটি ধ্বংস করে দাও তাহলে
পৃথিবীতে আর তোমার বন্দেগী হবে না।"

এটা কোন সাধারণ মানুষের কথা ছিল না। এমন কথা বলার জন্য হুযূর (সা)-এর মত ভরসা ও ঈমান এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর মত যোগ্য সম্প্রদায়ই প্রয়োজন ছিল। তাদের ঈমান সম্পর্কে হযরত (সা)-এর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল, তাঁদের সম্পর্কে আমি যাই বলব, তারা তা বাস্তবায়িত করেই ছাড়বে। সেজন্যই তিনি আল্লাহকে বলতে পেরেছেন, হে আল্লাহ! তুমি কি চাও, এই বাঘ ভল্লুকরা এই মুমিনদের মাথা-মুণ্ড চিবিয়ে খাবে। তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। আমার কথা শুধু এইটুকু, এরা না থাকলে এই পৃথিবীতে তোমার প্রকৃত ইবাদত আর হবে না।

কিয়ামত পর্যন্তের জন্যে গ্যারান্টি

তারপর কি হলো?

বদর রণাঙ্গনে সব ধরনের লক্ষণ উপকরণ আয়োজন চিন্তা ও সম্ভাবনার বিপরীতে জয় হলো মুসলমানদের। এর অর্থ তো এটাই, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের সম্পর্কে এই গ্যারান্টি নিয়েছেন, এঁরা যতদিন বেঁচে থাকবে তোমার-ই কাজ করবে, তোমারই ইবাদত করবে। কিয়ামত পর্যন্তের জন্যে এই গ্যারান্টি। আর এদের প্রতি বিজয় দানের মর্ম তো এটাই, যেন আল্লাহও মেনে নিয়েছেন, এঁরা যত দিন এই পৃথিবীতে থাকবে কেবল তাঁর-ই গোলামি করবে।

বন্ধুরা!

আমার শেষ কথা এটাই, তোমরা এই সিদ্ধান্ত করে নাও, তোমরা জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মডেল পেশ করবে জাতির সামনে। দীনের দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য সময় বের করবে। পূর্ণ চিন্তা, ধ্যান ও একাগ্রতার সাথে সারা দুনিয়ার মানুষের হেদায়াতের চিন্তা করবে। ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করবে। তোমরা যদি ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে পার তাহলে তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, তোমাদের ভবিষ্যৎ সবই নিরাপদ ও সুরক্ষিত হবে।

দেখ, তোমরা যদি শুধু ব্যবসা, চাকরি, আর অর্থের চিন্তায়-ই বিভোর থাক তাহলে মারোয়াড়ী আর বেদীন ব্যবসায়ীদের সাথে তোমাদের কী পার্থক্য হলো?

তোমাদের বৈশিষ্ট্য তো হলো, যেখানে হেদায়েতের আলো নেই সেখানে হেদায়াতের প্রদীপ জ্বালাবে। যে দেশের ইথারে-শূন্যে আযানের ধ্বনি গুঞ্জরিত হয় না সেখানে আযানের বাণী শোনাবে। আজ তোমরা এই সিদ্ধান্তই করে নাও, আমরা চার দিকে ইসলামের আলো ছড়াব, নিজেদের জীবন ও কর্ম দ্বারা এবং দাওয়াত ও তাবলীগের মেহ্নত দ্বারা আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে যাব আমরা।

[এটি ১৯৬৯ ইং সালে ইংল্যান্ডের একটি তাবলিগী ইজতিমায় প্রদত্ত ভাষণ]

কুরআন ঃ একটি চিরন্তন মু'জিযা

পবিত্র কুরআনের পূর্বেও অনেক কিতাব নাযিল করেছেন আল্লাহ্ তাআলা। কিন্তু সেসব আসমানী গ্রন্থ্ সর্বদাই পরিবর্তন ও বিকৃতির শিকার হয়েছে, ধ্বংস ও বিবর্তনের অতলে হারিয়ে গেছে। এর মৌলিক কারণ হল, সেসব আসমানীগ্রন্থ নাযিল করেছেন আল্লাহ, কিন্তু তার সংরক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন সমকালীন আলিম-উলামার উপর। আল্লাহ নিজে কোন ভার নেননি। অধিকন্তু সেসব আসমানী গ্রন্থ্ তার সম্বোধিত ব্যক্তিদের, সমকালীন মানবগোষ্ঠীর প্রয়োজন মিটাতেও সক্ষম হয়েছিল এক সীমিতকাল পর্যন্ত। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে– "নিশ্চয় আমি তাওরাত নাযিল করেছি, যাতে হিদায়াত ও আলো রয়েছে। সেই মোতাবেক আল্লাহর অনুগত নবীগণ ইহুদীদের আদেশ করতে থাকেন। ফয়সালা দিতে থাকেন উলামা-মাশায়েখও। কারণ তাদেরকে এই গ্রন্থ্ দেখা-শোনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং তাঁরা রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন।" (মাইদা ঃ ৪৪)

এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য, গবেষণাসিদ্ধ বাস্তবতা এটা এবং যাদের প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তারাও একথা অকপটে স্বীকার করেছে। তারা পরিষ্কার ভাষায় বলেছে, অতীতকালে অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থ্গুলো রীতিমতই রদ-বদলের শিকার হয়েছে। স্বয়ং ইহুদী ইতিহাসবিদরাই এ বিষয়ে ঐকমত্য প্রকাশ করেছে যে, এ পর্যন্ত তিনবার তাওরাত গ্রন্থাবলী ধ্বংসের শিকার হয়েছে। প্রথমবার যখন বাবেলের বাদশাহ বুখতে নসর (NEBUCHADEZZAR) খৃস্টপূর্ব ৫৬৪-৬০৫ সালে ইহুদীদের ওপর আক্রমণ করে তখন সে বায়তুল মুকাদ্দাসকে জ্বালিয়ে দেয়। এই সময় হযরত সুলায়মান (আ) কর্তৃক সংরক্ষিত তাওরাতের বিভিন্ন কপি হযরত মূসা (আ) ও হযরত হারূন (আ)-এর তাবারুকসমূহও বায়তুল মুকাদ্দাসে ছিল। এই অগ্নি সংযোগে তাওরাত ও তাবারুকের সকল সংগ্রহই ভস্মীভূত হয়ে যায়। আর যেসব ইহুদী এই অগ্নিকাণ্ড থেকে বেঁচে গিয়েছিল তাদেরকে নিয়ে বন্দি করা হয়েছিল বাবেলে। সেখানে তারা পঞ্চাশ বছর বন্দি জীবনযাপন করেছিল। অতঃপর 'তাওরাহ' বলে খ্যাত পাঁচটি সহীফাকে আযারা নবী তাঁর স্মৃতির সাহায্যে দ্বিতীয়বার লিপিবদ্ধ করান। নিজস্ব

মুখস্থনির্ভর এই পাণ্ডুলিপিকেই তিনি আসমানী কিতাব হিসেবে দাঁড় করান এবং ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকে ইতিহাসের কায়দায় ঢেলে সাজান। তারপর ইহুদী পণ্ডিত নাহ্‌মিয়া এক্ষেত্রে আরেকটু অগ্রসর হয়েছেন এবং হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ যাবুর গ্রন্থও এর সাথে যুক্ত করেছেন।

আন্‌তাকিয়ার তৎকালীন বাদশাহ্ ছিলেন চতুর্থ এনটিউখুস (ANTIÓCHUS)। তার উপাধি ছিল বেকানুস। এই বেকানুস বায়তুল মুকাদ্দাসের ওপর আক্রমণ করে খৃষ্টপূর্ব ১৬৮ সালে। ছিনিয়ে নেয় বায়তুল মুকাদ্দাসের স্বাধীনতা। জ্বালিয়ে দেয় সকল আসমানী গ্রন্থ্। সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তাওরাতের তিলাওয়াত। নিশ্চিহ্ন করে দেয় ধর্মীয় সকল ঐতিহ্য-মিনার। অতঃপর ইহুদী মুকাবী নতুন করে আসমানী গ্রন্থ্ সংকলনে মনযোগ দেন। প্রাচীন যুগে আসমানী গ্রন্থ্ সংকলনের এটা তৃতীয় পর্যায়।

অতঃপর ৭০ খৃস্টাব্দে রোমান বাদশাহ্ টাইটাস (TITUS) তৃতীয় বারের মত বায়তুল মুকাদ্দাস আক্রমণ করে এবং হায়কাল-ই-সুলায়মানসহ ধ্বংস করে দেয় তখন বিজয়ের স্মৃতিস্বরূপ আসমানী গ্রন্থগুলোর সকল কপি রোমের রাজধানীতে নিয়ে যায়। বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে ইহুদীদেরকে দেশান্তর করে সেখানে ভিন্ন শ্রেণীর বসতি স্থাপন করে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আসমানী গ্রন্থমালার ইতিহাস পড়া যেতে পারে।

নবী-রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ এসব আসমানী গ্রন্থের সত্যতা, সংরক্ষণ ও মূলমাফিক হওয়ার ব্যাপারে ইহুদীদের নিজস্ব মত ও দর্শন রয়েছে। সে দর্শন নিশ্চয় মুসলমানদের মত ও দর্শন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মুসলমানগণ আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআনের সত্যতা, সংরক্ষণ ও অবিকৃত হওয়া সম্পর্কে যে উচ্চ-কঠিন ধারণা পোষণ করেন তা অন্য সকল ধর্মাবলম্বীদের বোধের ঊর্ধ্বে। মুসলমানদের বিশ্বাস হল, পবিত্র কুরআনের প্রতিটি শব্দ আল্লাহর। আল্লাহ'র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। অবতীর্ণকাল থেকে অদ্যাবধি স্বমহিমায় সংরক্ষিত আছে। তাতে এক তিলও পরিবর্তন হয়নি। আর যদি একবিন্দু হেরফের হয়ে যায় তাহলে সেটাকে আর আসমানী গ্রন্থ বলা যাবে না। পক্ষান্তরে ইহুদীদের ধারণা হল, কোন গ্রন্থে সামান্য-বিস্তর রদ-বদল হলে, হ্রাস বৃদ্ধি হলেই সেটা আসমানীগ্রন্থ হতে পারবে না এমন কোন কথা নেই। তাছাড়া তাদের মতে আসমানী গ্রন্থকে নবীর 'রচনা' বলতেও আপত্তি নেই। আমরা এ সুবাদে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরছি, যার আলোকে আসমানী গ্রন্থ সম্পর্কে ইহুদীদের মত-দর্শন এবং আকীদা-বিশ্বাস খুব সহজেই

নির্ণয় করা যাবে। বিশিষ্ট উল্লেখযোগ্য ইহুদী পণ্ডিতদের সৃষ্টি ইহুদী ইনসাইক্লোপেডিয়াতে আছে–

"ইহুদী বর্ণনাগুলো যদিও এ বিষয়ে খুব জোর দিয়েছে যে, পুরাতন 'আহ্দনামা' (তাদের ধর্মগ্রন্থ) সেইসব লোকদেরই রচনা, যাঁদের আলোচনা বিধৃত হয়েছে এই কিতাবে। এবং এটা অনুচিত কিছুও নয়। অধিকন্তু একথা মানতেও তাদের কোন আপত্তি নেই, আসমানী গ্রন্থগুলোতে পরে কিছু রদ-বদল হয়েছে এবং কিছু পরিবর্তনও হয়েছে। (জিউস ইনসাইক্লোপেডিয়া, ৯৩ পৃ,)

পুরাতন ইহুদী বর্ণনা মতে, হযরত মূসা (আ)-এর মৃত্যু সংক্রান্ত আটটি আয়াত ছাড়া অবশিষ্ট পাঁচটি অধ্যায় হযরত মূসা (আ)-এর রচনা। তবে এসব গ্রন্থের বিপরীত বিভিন্ন বর্ণনার প্রতি 'রাব্বী' সবিশেষ নজর রাখতেন এবং এগুলোর সুন্দর সংশোধনীও দিতেন। (প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, ৫৮৯ পৃ,)

স্পিনোযা (SPINOZA) বলেছেন, তাওরাতের প্রথম পাঁচটি অধ্যায় হযরত মূসা (আ) কর্তৃত গ্রন্থিত চূড়ান্ত তথ্য। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পুরাতন 'আহ্দনামা'র প্রথম পাঁচটি অধ্যায় মূলত কমপক্ষে আটাশটি উৎস থেকে গৃহীত ও সংকলিত।" (প্রাগুক্ত)

আর কথিত চার ইঞ্জীলের দশা আরও শোচনীয়। 'আহ্দে জাদীদ' নামে খ্যাত এই গ্রন্থের সংকলকদের অবস্থা এত গভীর সংশয় দুর্বোধ্যতা আর জটিলতায় পূর্ণ যে, এর আলোকে হযরত ঈসা (আ)কে উদ্ধার করা একান্তই দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই গ্রন্থ ঈসা (আ)কে এমন এক দুর্ভেদ্য প্রাচীরের আড়ালে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে, যা কোন ঐতিহাসিক কিংবা গবেষকের পক্ষেই ডিঙানো সম্ভব নয়। এসব ইঞ্জীলগ্রন্থ রীতিমতই ধর্মীয় বিভিন্ন কাউন্সিলে বিভিন্ন সময়ে নানা রকম পরিবর্তন-পরিবর্ধনের শিকার হয়েছে। আজ এসব গ্রন্থ পড়লে এগুলো ওহী ও ইলহাম নির্ভর কোন আসমানীগ্রন্থ বলে মনে হয় না বরং মনে হয় ইতিহাস, কিচ্ছা-কাহিনী ও গল্পগ্রন্থ। এদের ইতিহাস ও অতীত সম্পর্কে ওয়াকেফহাল যে কোন পাঠকই এর সাক্ষি দেবেন।

সত্যিকথা বলতে কি, মুসলমানদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর হাদীসগ্রন্থের সমকক্ষও নয় এসব আসমানী কিতাব। সনদ-সূত্র আর বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর হাদীসগ্রন্থ 'সিহাহসিত্তা'র সাথে তো এর তুলনা করাও অপরাধ। কারণ, এসব হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত প্রতিটি হাদীসের সাথে সংকলক থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত যথার্থ যোগসূত্রের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। নির্ভরযোগ্য, পূর্ণ সততা, দীনদারী,

নিষ্ঠা ও সর্তকতায় উত্তীর্ণ বর্ণনাকারিগণের সূত্র– পরম্পরাসহ বর্ণিত হয়েছে এসব হাদীসগ্রন্থে। গভীরভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে, যাতে কোন প্রকার ক্রুটি ও চারিত্রিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত কোন হাদীস সংকলনের অন্তর্ভুক্ত না হয়। অথচ আমরা লক্ষ্য করলে দেখব, ইঞ্জীলের কোন গ্রন্থেই সনদ ও বর্ণনাসূত্রের তোয়াক্কা করা হয়নি। কোন তথ্য কিংবা ঘটনার সাথেই তার সূত্র উল্লেখ করা হয়নি। এসব সত্যের সাথে না সংকলকের সনদ উল্লেখ রয়েছে, না হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত ঘটনার সূত্র-পরম্পরা রয়েছে।

তাছাড়া আমাদের হাতে বর্তমানে যেসব গ্রন্থ রয়েছে সেগুলো সবই অনূদিত গ্রন্থ। হযরত ঈসা (আ) এবং তার সম্প্রদায় যে ভাষায় কথা বলতেন সে ভাষায় গ্রন্থিত কিতাব আমাদের হাতে নেই বরং ভাষান্তরের বিভিন্ন স্তর-বিভিন্ন হাত পার হয়ে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাই এসব গ্রন্থকে আমরা বড়দের জীবনী, ইতিহাস, ঘটনাবলী এবং ওয়াযের কিতাব বলতে পারি। এসব ধর্মগ্রন্থকে আমরা সাধারণ মুসলমানদের মাঝে পরিচিত মিলাদনামার মতই বলতে পারি। অথবা সর্বোচ্চ চতুর্থ শ্রেণীর হাদীস গ্রন্থের মর্যাদায় আসীন করতে পারি। আর শিক্ষিত মুসলমানগণ জানার কথা, চতুর্থ শ্রেণীর হাদীসগ্রন্থগুলোতে বিশুদ্ধতা ও সূত্রপরম্পরার উন্নত মাপ বজায় থাকেনি। সুতরাং এসব তথ্যের আলোকে আমরা স্পষ্ট করেই বলতে পরি, এসব আসমানীগ্রন্থকে পবিত্র কুরআনের সাথে তুলনা করা নিতান্তই অনর্থক।

প্রাচ্যের বিশিষ্ট গবেষক, নওমুসলিম, মুসিভ্ওয়াতিন ডিনিয়া (DIENEATON) এসব ইঞ্জীলগ্রন্থের পরিচয়, ইতিহাস ও জ্ঞানগত মান নির্ণয় করতে গিয়ে যথার্থই লিখেছেন–

“এতে কোন সন্দেই হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের ভাষায় অবতীর্ণ যে ইঞ্জীল গ্রন্থ আল্লাহ তাঁকে দান করেছিলেন তা লীন হয়ে গেছে। এখন আর তার কোন নামগন্ধও নেই। হয়তো সেই গ্রন্থ নিজে নিজেই ধ্বংস হয়ে গেছে অথবা কেউ ধ্বংস করে ফেলেছে। যে কারণে একটি কিতাবের পরিবর্তে খৃস্টানরা চারটি গ্রন্থ গ্রহণ করেছে যার ঐতিহাসিক ভিত্তি এবং বিশুদ্ধতার মাপকাঠি সবই চরমভাবে সন্দেহযুক্ত। এর একটি বড় কারণ হল, এসব গ্রন্থ এখন গ্রীক ভাষায় সংরক্ষিত। আর গ্রীক ভাষার স্বভাব কখনই হযরত ঈসা (আ)-এর মূল ‘ছামী’ ভাষার স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বরং দুটো দুধারার ভাষা। তাই এসব গ্রীক ইঞ্জীলগ্রন্থের সম্পর্ক মূল আসমানী গ্রন্থের সাথে সীমাহীন দুর্বল হয়ে পড়েছে।”

খোদ বাইবেলের বিভিন্ন বর্ণনায় ইঞ্জীলের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ভুল,স্পষ্ট বৈপরীত্য ও বিবেক-বুদ্ধিবিরোধী বহু বিষয়ের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। বাইবেলে স্বয়ং আল্লাহ তাআলাকে এমনসব অভিধায় চিত্রায়িত করা হয়েছে যা কখনো আল্লাহ তাআলার মহান সত্তার পক্ষে মানানসই নয় এবং এসব বিষয় তাঁর মহিমান্বিত সত্তা ও গুণাবলীকে চরমভাবে আহত করে। যে কোন সুস্থ বিবেকবান মানুষই একথা স্বীকার করবেন। অধিকন্তু আল্লাহ তাআলার নির্বাচিত নবী-রাসূলগণকে এমন সব মিথ্যাচার ও অকথ্য অভিযোগে আক্রান্ত করা হয়েছে, একজন সাধারণ ভদ্র মানুষও যেসব অপরাধের শিকার হয় না। এছাড়া আরও এমন অনেক প্রমাণ রয়েছে যেগুলো স্পষ্টই প্রমাণ করে বাইবেল প্রকৃত অর্থেই বিপুল বিকৃতি ও সংযোজনের শিকার হয়েছে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানভী'র ইযহারুল হক' দেখা যেতে পারে। মাওলানা (রহ) তাঁর এই কালজয়ী গ্রন্থে বাইবেলের ১২২টি শাব্দিক পারস্পরিক বৈপরীত্য ও ১০৮টি এমন স্পষ্ট ভুল চিহ্নিত করেছেন যেগুলোর কোন ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই।

পবিত্র মক্কা শরীফে সমাধিস্থ মাওলানা কিরানভীর (মৃ. ১৩০৮ হি) এই গ্রন্থটি মূলত আরবী ভাষায় প্রণীত। এর সুন্দর সাবলীল উর্দু অনুবাদ করেছেন আমাদের সম্মানিত সুহৃদ মাওলানা তকী উসমানী। উর্দু ভাষায় অনূদিত তিন খণ্ডে 'বাইবেল সে কুরআন তক' নামে প্রকাশিত এই গ্রন্থের প্রারম্ভে মাওলানা উসমানী একটি তথ্যসমৃদ্ধ মূল্যবান ভূমিকাও লিখেছেন।

এই গ্রন্থে সেসব আসমানী গ্রন্থের অবস্থা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যেগুলোর অনুসারী এক বিশাল সম্প্রদায় হাজার হাজার বছর ধরে গভীর শ্রদ্ধার সাথে এগুলোকে বুকে জড়িয়ে আছে। বিশেষ করে পৃথিবীর দুটি বিখ্যাত শিক্ষিত সভ্য-সম্প্রদায় এগুলোর অনুসারী। ইহুদী-খৃস্টান নামে পরিচিত এই দুই সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি দিয়েছেন মুসলমানরাও। স্মরণ করেছেন 'আহ্লে কিতাব' নামে। কিন্তু ভারতের 'বেদ' আর ইরানের 'বেস্তা' এত প্রাচীন যে এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক নির্দেশনা খুবই অপ্রতুল। এসব ধর্ম-দর্শনের প্রকৃতি, দর্শন ও মূল লক্ষ্য আবিষ্কার এক মহা দুরূহ ব্যাপার। এগুলোর সত্যতা চরম সন্দেহগ্রস্ত, এসব ধর্ম মতের সূচনাকাল নির্ধারণ করা সাধ্যাতীত এবং অসম্ভব।

THE SOCIETE ASIATIQUE OF PARIS এর সদস্য A. BARTH তার বিখ্যাত গ্রন্থ THE RELIGIONS OF INDIA (হিন্দুস্তানী মাযাহিব) এ লিখেছেন– 'আমরা যদি কিছু বর্ধিত বিষয় আলাদা করে ফেলি এবং গভীর

অনুসন্ধানের মাধ্যমে তা করা সম্ভবও বটে– তাহলে এর মূল ভাষ্যটা বেরিয়ে আসবে এবং একথাই প্রমাণিত হবে– এটা আল্লাহ'র পক্ষ থেকে প্রেরিতও নয়, আবার কোন কৃত্রিম উপায়ে এর বয়সকালকেও গোপন করে রাখা হয়নি। তবে এর ভাষ্য জগতে যথেষ্ট রদ-বদল হয়েছে, কর্তন-বর্ধন হয়েছে। অথচ হয়েছে সম্পূর্ণ ভাল নিয়তে, সৎ উদ্দেশ্যে। এতকিছু সত্ত্বেও কিন্তু এসব ধর্মগ্রন্থের বয়স নির্ধারণ করা অসম্ভব। আর 'ব্রাহ্মণ্যবাদ লিপির আওতায় এসেছে সবার পরে। এটা হয়তো আমাদের যুগ থেকে পাঁচশ বছরের বেশি পুরাতন হবে না। বেদের অবশিষ্ট বিষয়গুলো আরও পুরাতন। কত পুরাতন তা বলা মুশকিল।"

তাছাড়া হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে হিন্দু গবেষকরা কি বলেন তাও লক্ষ্য করার মত। তাদের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে তাদের বন্ধনহীন গবেষণা, চিন্তা-চেতনা কোন পর্যায়ে তা নিম্নের কয়েকটি উদ্ধৃতি থেকেই ভাস্বর হয়ে উঠবে আশা করি।

কলকাতা ইউনিভার্সিটি'র প্রখ্যাত লেকচারার সিরিশ চন্দ্র চক্রবর্তী তদীয় গ্রন্থ—PHILOSOPHY OF THE UPANISHADS–এ লিখেন–'এ বিষয়ে দু'টি ভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। একটি বালগঙ্গাধর তিলকের, অন্যটি ম্যাক্স মুলারের। তিলকের ধারণা হল– বেদের প্রার্থনাগুলো হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের ৪৫০০ সাল পূর্বে অস্তিত্ব লাভ করেছে। আর ম্যাক্স মুলার মনে করেন, ঋগ্বেদ হযরত ঈসা (আঃ)'র জন্মের ২২০০ সালের অধিক পূর্বে অস্তিত্ব লাভ করেনি। অথচ তাঁর ধারণা, আর্য চিন্তাধারার সর্বাধিক পুরাতন উৎস এই ঋগ্বেদ।

অবশ্য ঋগ্বেদর জন্মকালের কথা বাদ দিয়েও একথা বলা যায়, এবং প্রত্যয়ের সাথেই বলা যায়– যদিও ঋগ্বেদ একটি একত্রিত সংকলন। কিন্তু তার সবগুলো অধ্যায় একই সময় লিখিত হয়নি। তাই তার লেখার তারিখ দেখে গ্রন্থের বয়স নির্ণয় করা অসম্ভব।" (পৃ, ২৪-২৯)

বেদের মৌলিক চিন্তাধারা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে ভারতীয় প্রখ্যাত গবেষক ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ (ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট) তদীয় গ্রন্থ 'ইন্ডিয়ান ফিলোসফি'তে লিখেন ঃ বেদকর্তৃক পেশকৃত চিন্তা দর্শনটা কি তা সুনির্ধারিত নয়, স্পষ্টও নয়। যে কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক এটাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। বিভিন্নভাবে কাজেও লাগাতে পারে। ভেদের ভেতর এমন বিশালত্ব রয়েছে, লেখক-গবেষকগণ নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী এগুলোকে গ্রহণ করতে পারে এবং ইচ্ছামাফিক ব্যবহার করতে পারে। (পৃ, ২১-২২)

আর ইরানীদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ 'বেস্তা' সম্পর্কে এক পশ্চিমা গবেষকের মতামত সর্বশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে, যার দীর্ঘদিনের গবেষণার বিষয়ই ছিল

এটা। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির 'সামী লিসান্স' বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান রবার্ট এইচ পফায়ের নামী এই গবেষক 'ইনসাইক্লোপেডিয়া অফ রিলিজিয়নে' লিখেন–

"সকল জ্ঞানের এক মহা সংকলনের নাম ছিল 'আহ্‌লে বেস্তা'– অবশ্য তাদের বর্ণনা অনুযায়ী যার অধিকাংশ অংশ বাদশাহ সিকান্দর ধ্বংস করে দিয়েছিল। তারপর যা বেঁচে গিয়েছিল খৃষ্টাব্দ তৃতীয় শতাব্দীতে তার একটি সংকলন তৈরি করা হয় এবং এটি একুশটি অধ্যায়ে সাজানো হয়। তা থেকেও VENDIDAD নামের অধ্যায়টি সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত হয়। খৃষ্টাব্দ নবম শতাব্দীর পর কেবল মাত্র ইবাদত সংক্রান্ত কিছু বিষয় ভারতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেটাও ভারতে পাঁচ খণ্ডে সংরক্ষিত হয়। সেগুলোর নাম হল—

1, YASNA. 2. GATHA. 3. VESPERED. 4. VENDIN. 5. KHORDA AVASTA."

কিন্তু আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ অবতীর্ণ কিতাব মহাগ্রন্থ আল-কুরআন খুলে পড়ুন। পূর্ববর্তী সকল কিতাবের মূল বিষয়বস্তু সমহিমায় সংরক্ষিত হয়েছে এতে। বিশ্বমানবতার যথার্থ হিদায়াত, সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সর্ম্পক, প্রিয় নবীজীর আবির্ভাব থেকে কিয়ামত অবধি আল্লাহ'র পথে দাওয়াতের সমুজ্জ্বল পরিপূর্ণ শিক্ষা যথাযথভাবে উপস্থাপিত রয়েছে এই গ্রন্থে। অথচ এই গ্রন্থের অবস্থা অন্য আসমানী গ্রন্থগুলোর মত নয় বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন বিভায় উদ্ভাসিত। এই কিতাব নাযিল করেছেন যিনি, যাঁর অপার রহমতে অবতীর্ণ এই মহান বরকতপূর্ণ গ্রন্থ, তিনি নিজেই দায়িত্ব নিয়েছেন এর সংরক্ষণের। কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধনের শিকার হবে না এই কিতাব– একথা বলে দিয়েছেন অবতীর্ণকারী নিজে। ইরশাদ হয়েছে–

'এক মহা মর্যাদাবান গ্রন্থ এটা। অগ্র-পশ্চাৎ কোন দিক থেকেই কোন মিথ্যা গ্রাস করতে পারবে না এই কিতাবকে। গুণময় প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এই কিতাব।' (হা-মীম-সিজদা)

এই কিতাব বিকৃত হবার সুযোগ নেই। কোন আঁধারচারীর হাতে আহত হবে না, কোন দুর্ঘটনায় পড়ে হারিয়ে যাবে না, বিস্মৃত হবে না কোন দিন এই মহান কালাম যেমনটি হয়েছে তাওরাতের ক্ষেত্রে, ইঞ্জীলের ক্ষেত্রে। এ মর্মে করুণাময় বলেছেন ঃ 'সন্দেহ নেই, এই উপদেশ (গ্রন্থ) আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং আমি-ই এর সংরক্ষণ করব।" (আল-হুজর)

এই সংরক্ষণের অর্থ হল, কুরআনের হিফ্‌য, হিফাযত, প্রচার–প্রসার, তিলাওয়াত, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ সব কিছুর ব্যবস্থাই আমি করব। অধিকন্তু বাঁচাব সব রকমের ধ্বংসের হাত থেকে।

এক কথায়, পবিত্র কুরআন যেভাবে– যে মহিমায় অবতীর্ণ হয়েছে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওপর ঠিক তেমনিভাবে সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মহান রাব্বুল আলামীন এবং এর জন্য উপযুক্ত মানব কাফেলা, প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক সব রকমের উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করেছেন এবং যথার্থভাবে কাজে লাগিয়েছেন। তাই দেখা গেছে, যখনই কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, ধ্বনিত হয়েছে প্রিয় নবীজীর পাক যবানে অমনি তৃষ্ণার্ত চাতকের মত মুখে তুলে নিয়েছেন হযরাতে সাহাবায়ে কেরাম– প্রথম যুগের স্বচ্ছ-হৃদয় মুসলমানগণ। অতঃপর আত্মস্থ করতে হৃদয়ঙ্গম করতে সাধ্যাতীত মনযোগী হয়েছেন এবং এ পথে করেছেন তাঁরা বিস্ময়কর প্রতিযোগিতা। কুরআনের প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম প্রেম, কুরআনের অপূর্ব-অনুপম সাহিত্য শিল্প, শব্দের লালিত্য ও মাধুরিমাই ছিল এর প্রধান কারণ ও আকর্ষণ। অধিকন্তু কুরআন বহনকারীদের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণিত ইলাহী ভাষ্য আর নববী ফরমান করতো তাঁদেরকে উৎসাহিত-উদ্বেলিত। তাছাড়া মুসলমানদের নামায, ইবাদত, দৈনন্দিন জীবন-বিধান, সমাজ-সংস্কৃতি ও সাহিত্যসহ জীবনের সকল বিন্দুই সম্পৃক্ত এই কুরআনের সাথে। সকল অঙ্গনই প্লাবিত-আলোকিত কুরআনের চিরন্তন সুধা ও বিভায়। যার ফলে কুরআনের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক আন্তরিকতা থেকে গভীর ভালবাসা পর্যন্ত ছুঁয়ে গেছে এবং ইসলামের সূচনাকালেই কুরআন মুখস্থকারী 'হুফ্ফাযে কুরআনে'র এক বিরাট বিস্ময়কর কাফেলা তৈরি হয়ে গেছে।

দেখা গেছে, হিজরী তৃতীয় বর্ষে সংঘটিত বি'রে মা'উনা' নামক ঘটনায় এমন সত্তরজন সাহাবী শাহাদাতবরণ করেন যাঁদের সকলেই ছিলেন পবিত্র কুরআনের হাফেয আলেম। অতঃপর সেই গতি ধীরে ধীরে বেগবান হয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে হাফেযে কুরআনের সংখ্যা। যুগে যুগে মুসলমানগণ বরকতময় এই গ্রন্থকে স্থানান্তর করেছেন হৃদয় থেকে হৃদয়ে, যবান থেকে যবানে। বিস্ময়কর এই পদ্ধতি বিশ্বময় ছোট-বড় সকল শহর ও লোকালয়ে অবিরাম গতিতে চলতে থাকে। তাছাড়া পবিত্র কুরআন মুখস্থকরণ, তিলাওয়াতের মান উন্নত ও সুন্দরতম করণ ও ইবাদতের মধ্যে অধিক পরিমাণে তিলাওয়াতকরণের প্রতি মুসলমানদের মধ্যে যে উচ্ছাসিত প্রতিযোগিতা হয় তা হয়তো কোন অমুসলমানকে বিশ্বাসও করানো যাবে না। তবে কোন অমুসলমান যদি মুলমানদের পরিবেশে কিছু দিন অবস্থান করে থাকেন, মুসলমানদের সাথে উঠা-বসা করে থাকেন তাহলে হয়তো কিছুটা অনুমান করে থাকবেন। পবিত্র কুরআনের হাফেযদের সংখ্যা সর্বযুগেই ছিল শুমার ঊর্ধ্ব আর এখনতো লক্ষ-লক্ষ।

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যথার্থ উত্তরাধিকারী এবং মুসলমানদের অভিভাবকগোষ্ঠীর হৃদয়রাজ্যকে অলৌকিকভাবে আকৃষ্ট করে দিয়েছেন এ বিষয়ের প্রতি। পবিত্র কুরআনের হিফাযত ও সংরক্ষণের প্রতি। ইয়ামামার যুদ্ধে যখন বিপুল পরিমাণ হাফেযে কুরআন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন তখন বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম বিশেষভাবে ভাবতে শুরু করেন। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম আশংকা করেন হযরত উমর (রা)। তাছাড়া উম্মতের কল্যাণ কামনা, উম্মতের অনিবার্য প্রয়োজন উপলব্ধিতে উমর তো সর্বদাই অগ্রণী ছিলেন এবং তাঁর বক্তব্য রীতিমতোই উন্নীত হতো শরীয়তের শ্রেষ্ঠ মানে। স্পর্শ করতো শরীয়তের পবিত্র লক্ষ্য। তাই ইয়ামামার যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনিই সর্বপ্রথম খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর (রা)-এর সামনে প্রস্তাব করেন পবিত্র কুরআন সংকলনের জন্য। চামড়ার টুকরো, খেজুরের ছাল আর সাদা পাথরে লিপিবদ্ধ এবং মানুষের হৃদয়ে সংরক্ষিত কুরআনকে একটি সুবিন্যস্ত সংকলিত গ্রন্থের রূপ দেয়ার সুপারিশ করেন হযরত উমর (রা)। বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করেন হযরত আবু বকর (রা)। আল্লাহ তাআলা বিষয়টির তীব্র প্রয়োজনের কথা হযরত আবু বকরের হৃদয়েও বদ্ধমূল করে দেন। দ্বিধাহীনভাবে তিনিও সম্মত হোন পবিত্র কুরআনের সংকলন তৈরি করতে। সাহাবী হযরত যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) কে এর দায়িত্ব দেন। তিনি অসীম ঐকান্তিকতা, আন্তরিকতা ও নিশ্ছিদ্র সতর্কতার সাথে এই দায়িত্ব পালন করেন। পবিত্র কুরআনকে হাফেযদের সীনা, ওহী লেখকদের লিখিত কপি ও বিভিন্ন সুরক্ষিত লিখিত সামগ্রী থেকে একটি মাত্র গ্রন্থের রূপে লিখিত সংকলন করেন। সমগ্র উম্মত গভীর বিশ্বাস, আস্থা ও আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেন এই সংকলনকে।

তারপর এলো তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর যুগ। বন্যা বয়ে গেলো বিজয়ের। দেশের পর দেশ নীত হলো ইসলামের পতাকাতলে। শান্তির ছায়াতলে। ছড়িয়ে পড়লো মুসলমানগণ দেশে দেশে। ছড়িয়ে পড়লেন কুরআনের হাফেযগণ। নবদীক্ষিত মুসলমানগণ গ্রহণ করলেন বিভিন্ন হাফেযের তিলাওয়াত-বিভিন্ন কারীর কিরাত। ফলে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন কিরাত-উৎসারিত তিলাওয়াতের বিভিন্ন রূপের বিকাশ ঘটতে থাকে। তাছাড়া অনারবদের বিপুল সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণের ফলে তাদের নিজস্ব উচ্চারণের-বাচনভঙ্গির প্রভাব পড়তে থাকে কুরআন তিলাওয়াতে। তখন সাহাবায়ে কিরাম (রা) আশংকা করলেন, কুরআনের আসমানী উচ্চারণে ফের বিকৃতি এসে যায় কিনা। তাঁরা বিষয়টি খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উসমান

(রা)-এর নজরে আনেন। তিনি ভাবেন, সক্রিয় হোন এবং হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে সংকলিত সবগুলো কপি একত্রিত করে তার ভিত্তিতে কিরাতে মুতাওয়াতির মাফিক একটি সংকলন তৈরির আদেশ দেন। অতঃপর সেই সংকলনের অনেকগুলো কপি করিয়ে প্রত্যেকটি ইসলামী জনবসতিতে একটি করে কপি প্রেরণ করেন। একটি কপি সংরক্ষণ করেন পবিত্র মদীনায়। এই কপিটির নাম ছিল আল-ইমাম। তৎকালীন মুসলিম বিশ্ব কুরআনের এই সংকলনটি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে এবং এর ওপরই প্রজন্মের পর প্রজন্ম যুগের পর যুগ চলতে থাকে। তাঁরা এর হিফাযত করতে থাকেন। কুরআনের মধুময় তিলাওয়াতে সজীব হয়ে ওঠে তাঁদের জীবন-ইবাদত। অদ্যাবধি মুসলিম বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত হযরত উসমান (রা) কর্তৃক সংকলিত কুরআনই গৃহীত, পঠিত ও সংরক্ষিত আছে।

২৫ হি. সালে সংকলিত এই গ্রন্থের প্রতি আজ পর্যন্ত কোন মুসলমান দ্বিমত পোষণ করেনি। এমন কি গবেষণা ও অনুসন্ধানের জন্য কোন প্রাচীন কপির সন্ধান করেনি কেউ কোন মিউজিয়ামে, কোন প্রাচীন যাদুঘরে।

বিশিষ্ট গবেষক মিষ্টার আই মাঙ্গানা– প্রফেসর মানচেষ্টার ইউনিভার্সিটি বলেন ঃ ইউরোপের লাইব্রেরীগুলোতে পবিত্র কুরআনের প্রাচীন অনেক কপি আছে। হাতে লেখা কপি। এর মধ্যে সর্বাধিক প্রাচীন কপিটি হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে তৈরী। কিন্তু এসব কপির মধ্যে পারস্পরিক কোন পার্থক্য নেই। যা আছে তাহলো লিপিগত ব্যবধান। এর কারণ হলো, প্রাচীন যুগে হস্তলিপি তত উন্নত ছিল না। ইনসাইক্লোপেডিয়া অফ রিলিজিয়নের গবেষক NOELDEKEও একই মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

মুসলমানগণ কুরআন যখন সংকলন করেছেন তখন থেকে অদ্যাবদ্ধি এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তাদের অপূর্ব ঐকমত্য ও ইজমা রয়েছে। আর উলামায়ে কিরামের আধিক্য, অগণিত হাফেযে কুরআন, অধিকন্তু কুরআনে কারীমের বিপুল প্রচার ও প্রসারের ফলে এখন আর এর পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এ এক বিস্ময়কর সংরক্ষিত গ্রন্থ। ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায় এই স্বীকারোক্তির উল্লেখ আছে ঃ এই পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ হলো আল-কুরআন। *(১ম খণ্ড, ৫৪৮-৫৪৯ পৃ,)*

পাশ্চাত্য এবং ইউরোপের গবেষকরা যারা পবিত্র কুরআনকে আসমানী গ্রন্থ মনে করে না, মনে করে না এটা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ– তারাও পবিত্র কুরআনের হেফাযত ও সংরক্ষণের ব্যাপারে একমত। আমরা এখানে কয়েকজন খৃষ্টান মনীষীর কথা উল্লেখ করছি।

স্যর উইলিয়ম ম্যুয়র। ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি বিদ্বেষের জন্যে তিনি বেশ খ্যাতি লাভ করেছেন এবং নন্দিতও হয়েছেন আপন অঙ্গনে। তিনি তার হৃদয়ের পূঞ্জীভূত দ্বেষ-ক্লেদ মিশিয়ে রচনা করেছেন 'লাইফ অফ মুহাম্মদ।' যার জবাবে কলম ধরতে বাধ্য হয়েছেন ভারতীয় আধুনিক শিক্ষার পতাকাবাহী স্যার সৈয়দ আহমদ খান। লাইফ অফ মুহাম্মদের জবাবে লিখেছেন 'খুতুবাতে আহমাদিয়্যাহ।' ম্যুয়র তার লাইফ অফ মুহাম্মদে লিখেছেন ঃ

'হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ইন্তিকালের পর সিকি শতাব্দীর মধ্যেই মুসলমানদের মধ্যে কঠিন বিরোধ ও দলাদলির সৃষ্টি হয়। পরিণামে হযরত উসমান শহীদ হোন এবং এই যুদ্ধ-বিরোধ এখনও আছে। কিন্তু তাদের সকল দলের কুরআন একটিই। বিপুলসংখ্যক লোকের মাধ্যমে সর্বযুগেই সংরক্ষিত হয়েছে তাদের এই কুরআন। সকলের মধ্যেই বিপুলভাবে পঠিত-আদৃত হয়েছে এই একই কুরআন। এটাও অনস্বীকার্য সত্য, আজ আমাদের সামনে সেই কুরআনই সুরক্ষিত, বর্তমান–এক দুর্ভাগা খলীফা (হযরত উসমান)'র নির্দেশে যা সংকলিত হয়েছিল। হয়তো সারা পৃথিবীতে এমন কোন গ্রন্থ খুঁজে পাওয়া যাবে না, যা বারটি শতাব্দী কাল ধরে বিন্দু-বিসর্গসহ সংরক্ষিত হয়ে আসছে।"

WHERRY তদীয় তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন ঃ পৃথিবীর সমুদয় প্রাচীন গ্রন্থগুলোর মধ্যে শুধু কুরআনই অবিশ্রিত আছে, আছে খাঁটি ও স্বমহিমায় ভাস্বর।'

পবিত্র কুরআনের প্রসিদ্ধ ইংরেজী অনুবাদক PALMER বলেন ঃ হযরত উসমান কর্তৃক সংকলিত কুরআন অদ্যাবধি সর্বজনস্বীকৃত ও সমর্থিত। LANE POOLE বলেন ঃ 'কুরআনের একটি বড় সৌন্দর্য হল, এর খাঁটিত্ব ও মৌলিকত্ব নিয়ে কোন প্রশ্ন করা যায় না। সন্দেহ করা যায় না। এর প্রতিটি অক্ষর পড়ার সময় আমরা পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি, তেরশ' বছর পূর্বেও এটা এমনই ছিল। এর মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়নি।"

সন্দেহ নেই এটা একমাত্র কুরআনেরই বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের এই বৈশিষ্ট্য নেই।

[মনীষীদের এই সাক্ষ্যগুলো মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদীর ইংরেজী তাফসীর থেকে নেয়া হয়েছে।]

এদারায়ে কুরআন

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

ISBN. 984-600-005-7